Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা ইসলাম আশা

রোলঃ 227021884

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা ইসলাম আশা

রোলঃ 227021884

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফরোজা ইসলাম আশা, আইডিঃ 227021884 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Afroja

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আফরোজা ইসলাম আশা

আইডিঃ 227021884

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

রোজার পরিচিতি 12

রোজার ভাষাগত ও পরিভাষাগত অর্থ.. 14

রোজার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা.. 16

রোজার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 19

রোজার প্রকৃতি 24

রোজার ফজিলত ও উপকারিতা... 25

রোজার শর্তাবলী.. 26

বরকতময় রমাদান: দয়া, ক্ষমা ও মুক্তির পয়গাম 28

মাহে রমাদানে কুরআন তিলাওয়াত... 39

রমাদান : যে মাসে নবীজী দু'হাত ভরে দান করতেন 44

ইসলামে রোজার বিধান.. 47

বিভিন্ন ধর্মে রোজার অবস্থান ও ভূমিকা 52

কুরআন মজীদ ও সহীহ হাদীসের আলোকে রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত 55

রোজার ফজিলত (অপরিসীম পুরস্কার) 66

রোজার শারীরিক ও সামাজিক উপকারিতা 69

সামাজিক দিক: সহানুভূতি, দানে উৎসাহ... 71

রমাদান মাসের গুরুত্ব ও ফজিলত.. 72

নবীজি (সঃ) যেভাবে রমাদান কাটাতেন... 74

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য রোজা.. 84

তারাবীর নামাযে যত্নবান হই 87

ইতিকাফ : আল্লাহর নৈকট্য লাভের মহিমান্বিত ইবাদত.................................. 92

শবে কদর: গুরুত্ব ও ফজিলত 99
রমাদানে প্রচলিত ভুল 101
রোজা রাখার সময় সচেতনতা 107
রোজার সামাজিক এবং বৈশ্বিক প্রভাব 108
রোজার কথা মনে থাকুক বছর জুড়ে 110
কেমন হবে রমাদান পরবর্তী জীবন 112
উপসংহার 114
তালিকা ও রেফারেন্স 117

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি হলো রোজা। এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরজ করা ইবাদত, যা আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন, এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে রোজার বিধান নাজিল করেছেন এবং এর মাধ্যমে মানুষের জন্য জীবনযাপনের একটি মহান শিক্ষার পথ নির্ধারণ করেছেন। রমজান মাসে রোজা পালনের মাধ্যমে একজন মুমিন শুধুমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে সংবরণ করেন না, বরং নিজের আত্মাকে শুদ্ধ করেন এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

রোজা শুধুমাত্র শারীরিক ইবাদত নয়, এটি একটি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণও বটে। এটি মানুষের ধৈর্য, সংযম এবং আত্মসংবরণের শিক্ষা দেয়। একই সঙ্গে এটি সামাজিক সাম্য এবং দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। রোজার মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের নানা গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের পাশাপাশি একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলে।

এই থিসিসে রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে আলোচনা করা হবে। এতে কুরআন, হাদিস, ইসলামি ঐতিহ্য এবং আধুনিক গবেষণার আলোকে রোজার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হবে। রোজার মৌলিক উদ্দেশ্য, তাৎপর্য এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কীভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। এ ছাড়াও, রোজার শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উপকারিতাগুলো বিশ্লেষণ করা হবে।

রোজার গুরুত্ব বুঝতে হলে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, এটি শুধুমাত্র একটি ধারাবাহিক ইবাদত নয়; বরং এটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ, যা একজন মুমিনের আত্মা, মন ও দেহকে শুদ্ধ করে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি লাভের জন্য রোজার গুরুত্ব অপরিসীম।

এ থিসিসটি ইসলামী জ্ঞানের পাঠকদের জন্য একটি সহায়ক দৃষ্টিকোণ তৈরি করবে এবং রোজার গভীর তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজাতিকে আলোকিত জীবনযাপনের পথ দেখায়। ইসলামের প্রতিটি বিধান মানুষের কল্যাণের জন্য প্রণীত, এবং এর মধ্যে রোজা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। রমজান মাসে রোজা পালনের মাধ্যমে একজন মুমিন তার ইমানকে আরও দৃঢ় করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।

রোজা শুধু একটি শারীরিক উপবাস নয়, এটি একটি আত্মিক প্রশিক্ষণ, যা মানুষের জীবনযাপনকে সুশৃঙ্খল এবং মূল্যবোধসম্পন্ন করে তোলে। রোজার মাধ্যমে মানুষ ধৈর্য,

সংযম এবং আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা রোজার বিধান সম্পর্কে বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরজ করা হয়েছিল; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

— (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, রোজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা। এটি এমন একটি অবস্থা, যা মানুষের আত্মাকে পাপের প্রলোভন থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

রোজার গুরুত্ব শুধু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতাও নিশ্চিত করে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে রোজা পালনের মাধ্যমে শরীরের বিষাক্ত উপাদানসমূহ দূর হয় এবং হজম প্রক্রিয়ায় উন্নতি ঘটে। পাশাপাশি, এটি মানসিক শান্তি এনে দেয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণাবলি জাগ্রত করে।

তবে, রোজার তাৎপর্য কেবল ব্যক্তিগত জীবনের জন্যই নয়, বরং এটি সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রভাবশালী। রোজার মাধ্যমে একজন মুমিন ক্ষুধার্ত ও দরিদ্রদের কষ্ট উপলব্ধি করতে শেখে এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে। এ কারণে রমজান মাসে সাদকাহ, দান-খয়রাত এবং দুঃস্থদের সহযোগিতার একটি প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, যা সমাজে সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এই থিসিসের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এখানে রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হবে।

- **আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ**: রোজার মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এবং পাপ মোচন সম্ভব হয়।
- **সামাজিক দৃষ্টিকোণ**: সমাজে রোজার প্রভাব, দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ।
- **শারীরিক ও মানসিক দৃষ্টিকোণ**: রোজার উপকারিতা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এর ইতিবাচক দিকসমূহ।
- **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট**: রোজার বিধান এবং পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের জন্য এর অবস্থান।

এই থিসিসে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে রোজার বিধান ও ফজিলতের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি, এটি বর্তমান যুগে মুসলমানদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে রোজার গুরুত্ব তুলে ধরবে। আশা করা যায়, এই গবেষণা রোজার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়ক হবে এবং মানুষের জীবনে এ ইবাদতের গুরুত্ব আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে অসংখ্য আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরজ করা হয়েছিল; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"
— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াতে রোজার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে "তাকওয়া" বা আল্লাহভীতি অর্জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মানুষের আত্মাকে শুদ্ধ করার একটি মাধ্যম। রোজার ফজিলত এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ :إِنِّي صَائِمٌ .وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا :إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

"আল্লাহ বলেন: আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোজা আমার জন্য, এবং আমি এর প্রতিদান দেব। রোজা একটি ঢাল। যখন তোমাদের কেউ রোজা রাখে, সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং ঝগড়া না করে। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করে বা গালাগাল করে, সে যেন বলে 'আমি রোজাদার'। সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিন মিশকের ঘ্রাণের চেয়েও সুগন্ধিময় হবে। রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ: একটি আনন্দ ইফতারের সময়, এবং আরেকটি আনন্দ তার প্রতিদান পাওয়ার সময়।"
— (সহিহ বুখারি: ১৯০৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫১)

এই হাদিস থেকে রোজার গুরুত্ব এবং এর অনন্য বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ নিজে রোজার প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন, যা অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে অনন্য।

আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় রমজানের রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”

— (সহিহ বুখারি: ২০১৪, সহিহ মুসলিম: ৭৬০)

এই হাদিসে রোজার আধ্যাত্মিক ফজিলত এবং গুনাহ মোচনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রোজার ফজিলত কেবল আধ্যাত্মিক নয়; এটি মানুষের দেহ, মন এবং আত্মাকে শুদ্ধ করে এবং সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। এই থিসিসে রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করাহবে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রোজা পালনের মাধ্যমে একজন মুমিন কীভাবে তার ইমানকে সুসংহত করতে পারে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, তা তুলে ধরা হবে।

রোজার সংজ্ঞা (সঙ্গা)

রোজা (আরবি: **صوم** বা **صيام**) শব্দটি এসেছে আরবি "সাওম" শব্দ থেকে, যার অর্থ হলো **বিরত থাকা বা সংযম পালন করা**। ইসলামী পরিভাষায় রোজা হলো—আল্লাহর নির্দেশে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার, পাপাচার, এবং যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার নাম। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পালন করা হয় এবং আত্মশুদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

শব্দগত দিক থেকে صومএবং صيام উভয়টিই মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- ... الامساك। عن الفعلতথা কাজ থেকে বিরত থাকা। ২. কঠোর সাধনা করা। ৩. অবিরাম প্রচেষ্টা। ৪. আত্মসংযম।

صوم পারিভাষিক সংজ্ঞা:

১. আবুল হোসাইন কুদূরী ও জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন-

الصوم إمساك مخصوص في زمان مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম صومতথা রোজা।

২. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন-

الصوم هو الامساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النية অর্থাৎ, সাওম হলো সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তসহকারে পানাহার থেকে বিরত থাকা।
৩. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন-

الصوم هو ترك الاكل والشرب والوطي من الصبح الى غروب الشمس অর্থাৎ, সাওম তথা রোজা হলো সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা।

রোজার হুকুম:

রমজানের রোজা ফরজ। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী-

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর। (সূরা বাক্কারা-১৮৩)

অর্থাৎ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা

অত্র আয়াতের মাধ্যমেই রোজা ফরজ হয়েছে। আবার রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদীর ইজমা' ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, রমজানের রোজাকে অস্বীকার করলে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। মানতের রোজা ওয়াজিব। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী-

وليوفوا نذورهم

অর্থাৎ: তারা যেন তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে। (সূরা হজ্জ-২৯) উল্লেখ্য, হিজরি দ্বিতীয় সনে রমজানের রোজা ফরজ হয়েছে

কুরআনের আলোকে সংজ্ঞা:

রোজার সংজ্ঞা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরজ করা হয়েছিল; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"
— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, রোজা ফরজ করা হয়েছে আত্মশুদ্ধি এবং তাকওয়া অর্জনের জন্য। এটি আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের দেহ, মন এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার একটি মাধ্যম।

হাদিসের আলোকে সংজ্ঞা:

রোজার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য বোঝাতে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক হাদিসে রোজার সংজ্ঞা দিয়েছেন।

১. নফস নিয়ন্ত্রণ ও পাপ থেকে বিরত থাকা:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

:الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ.

"রোজা একটি ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ রোজা রাখে, সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং ঝগড়া না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়, তবে সে যেন বলে: 'আমি রোজাদার।'"
— (সহিহ বুখারি: ১৮৯৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫১)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, রোজা শুধু খাবার বা পানীয় থেকে বিরত থাকা নয়; বরং এটি নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে সংযম ও আত্মশুদ্ধির একটি প্রক্রিয়া।

২. আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জন:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার ওপর কাজ করা পরিত্যাগ করে না, আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই যে সে তার খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করবে।"
— (সহিহ বুখারি: ১৯০৩)

এই হাদিসে রোজার অন্তর্নিহিত অর্থ তুলে ধরা হয়েছে। শুধু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করাই নয়, বরং নিজেকে মিথ্যা, পাপাচার এবং সকল নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা রোজার মূল লক্ষ্য।

সংক্ষেপে:

রোজার সংজ্ঞা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে হলো:

- সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশে খাদ্য, পানীয়, এবং বৈধ শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা।
- নিজের নফসকে সংযত রাখা এবং তাকওয়া অর্জনের প্রচেষ্টা করা।
- পাপ কাজ, মিথ্যা কথা, এবং খারাপ আচরণ থেকে বিরত থাকা।

রোজা একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত যা শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে।

রোজার পরিচিতি

রোজা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ এবং এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইসলামী শরিয়তে "রোজা" (আরবি: صيام, Sawm) শব্দের অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাওয়া, পান করা এবং অন্যান্য কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকা। মূলত, রোজা বা সিয়াম হলো আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়া, পানীয় গ্রহণ এবং কিছু শারীরিক চাহিদা থেকে বিরত থাকার ইবাদত।

রমজান মাসে রোজা রাখাটা ফরজ, যা কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত। এটি একজন মুসলিমের বিশ্বাসের অংশ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের একটি মাধ্যম। রোজা শুধু এক ধরনের শারীরিক উপবাস নয়, বরং এটি আত্মশুদ্ধি, ধৈর্যশীলতা, সহানুভূতি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি অনন্য পদ্ধতি।

রোজার মৌলিক বিধান

রোজার মৌলিক বিধান হলো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা, দুঃশ্চরিত্রতা এবং অন্যান্য কিছু নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। রোজা পালন করতে হলে মুসলিমের কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন:

1. **ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস:** মুসলিম হতে হবে।
2. **বালেগ হওয়া:** শিশুরা রোজা রাখবে না যতদিন না তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়।
3. **বুদ্ধি ও সক্ষমতা:** অক্ষম বা মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোজা পালন বাধ্যতামূলক নয়।

রোজার সিয়াম এবং এর বিধান কুরআন ও হাদিসে

কুরআন

আল-কুরআনে রোজা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** "হে মুমিনরা! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোজাকে মুসলিমদের জন্য ফরজ করেছেন এবং তা পূর্ববর্তী জাতির ওপরও ফরজ ছিল। রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা, যা মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রতীক।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজার গুরুত্ব এবং তার বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। তিনি বলেছেন: **بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا**

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মদ (সা.)-এর রাসুলত্বের

সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং যারা হজে যেতে সক্ষম তাদের জন্য হজ পালন করা।"
— (সহিহ বুখারি: ৮)
এই হাদিসে রোজা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে, যা মুসলমানদের ঈমান ও আমলের অঙ্গ।
আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَسُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"যখন রমজান আসে, জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়ে।"
— (সহিহ বুখারি: ১৮৯৯, সহিহ মুসলিম: ১১০১)
এই হাদিসের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে মুসলিমদের জন্য এক বিশেষ রহমত এবং সওয়াব অর্জনের সুযোগ তৈরি করেন। শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, যাতে তারা মানুষের মধ্যে খারাপ কাজের প্ররোচনা দিতে না পারে।

রোজার ভাষাগত ও পরিভাষাগত অর্থ

রোজা (আরবি: **صيام** - সিয়াম) ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা মুসলমানদের জন্য ফরজ। রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেকে শুদ্ধ করা, তাকওয়া অর্জন করা এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। তবে রোজা শব্দটির ভাষাগত এবং পরিভাষাগত অর্থ জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে রোজার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

১. রোজার ভাষাগত অর্থ

রোজা (সিয়াম) আরবি শব্দ "صِيَامٌ" (সিয়াম) থেকে এসেছে, যার মূল অর্থ হলো **"বিরত থাকা"** বা **"অবস্থায় থাকা"**। এটি একটি সাধারণ শব্দ, যা বিভিন্ন ধরনের বিরত থাকার অর্থে ব্যবহার করা যায়। যেমন, কেউ যদি কোনো কাজ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাকে "সিয়াম" বলা যেতে পারে।

আরবিতে শব্দটির মূল ধাতু হলো "صَامَ" (সামা), যার মানে হলো **"বিরত থাকা"**। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কেউ যদি নিজের শারীরিক বা মানসিক ইচ্ছা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাকে সিয়াম পালনকারী বলা হয়।

উদাহরণ:

"صَامَ" (সামা) শব্দটি তাত্ত্বিকভাবে ব্যবহার করা হয়, যেমন:

صَامَ عَنِ الطَّعَامِ (সামা আনি তাআমি) - "খাদ্য থেকে বিরত ছিল।"

এখানে সিয়াম খাবার থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি আরো অনেক কিছু থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

২. রোজার পরিভাষাগত অর্থ

ইসলামে রোজার পরিভাষাগত অর্থ হলো **"আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিছু নির্দিষ্ট জিনিস থেকে বিরত থাকা"**। সাধারণত, রোজা রাখা মানে হলো, **সকালে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, খাদ্য, পানীয়, যৌন সম্পর্ক এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।**

এই পরিভাষাগত অর্থের মধ্যে আরও কিছু শর্ত এবং বিধান জড়িত, যা রোজাকে ইসলামী আইনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামি পরিভাষায় রোজা শুধু খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার বিষয় নয়, বরং এটি মন্দ কাজ ও খারাপ আচরণ থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।

রোজার পরিভাষাগত বিবরণ:

রোজা সাধারণভাবে ঈমানের সাথে, আল্লাহর সাওয়াব ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিশেষভাবে পালিত হয়। এতে একজন মুসলিম কিছু নির্দিষ্ট কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, যেমন:

1. **খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ:** রোজার সময় মুসলিমদের জন্য একমাত্র নির্দিষ্ট সময় (সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত) ছাড়া খাবার এবং পানীয় গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।
2. **যৌন সম্পর্ক:** সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যৌন সম্পর্ক থেকেও বিরত থাকতে হয়।
3. **অন্য সকল মন্দ কাজ:** মিথ্যা বলা, গীবত করা, অশ্লীল আচরণ করা এবং ইত্যাদি সমস্ত খারাপ কাজ থেকেও বিরত থাকতে হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও মন্দ কাজ করা ছেড়ে দেয় না, তার জন্য আল্লাহর কাছে রোজা রাখার কোন উপকারিতা নেই।"

— (সহিহ বুখারি: 1903)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রোজার পরিভাষাগত অর্থ কেবল খাবার থেকে বিরত থাকা নয়, বরং সকল ধরনের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

রোজার পরিভাষাগত এবং শারীরিক প্রভাব

রোজা শুধু আত্মিক বা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য নয়, বরং এটি শারীরিকভাবেও উপকারী। রোজা রাখার ফলে শারীরিকভাবে একজন মানুষ তার শরীরের অপচয় এবং ক্ষতিকর উপাদান (টক্সিন) থেকে মুক্তি পায়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে রোজা শরীরের বিপাক প্রক্রিয়াকে উন্নত করে এবং শরীরের ক্ষতিকর উপাদানগুলো বের করে দেয়।

এছাড়া, রোজা একজন মানুষকে ধৈর্যশীল, সহনশীল এবং আত্মসংযমী হতে সাহায্য করে, যা তার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

রোজার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা

রোজা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি একজন মুসলিমের জীবনে আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক শুদ্ধির একটি মাধ্যম। রোজার গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা বোঝার জন্য কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত নির্দেশনাগুলো বিবেচনা করা আবশ্যক। রোজা পালনের মাধ্যমে একজন মুমিন তার আত্মাকে শুদ্ধ করে, তাকওয়া অর্জন করে, এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

রোজার গুরুত্ব কুরআনের আলোকে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা রোজার ফরজ বিধান সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরজ করা হয়েছিল; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"
— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, রোজা শুধু ইসলামের বিধান নয়, বরং এটি পূর্ববর্তী উম্মতের ওপরও আরোপিত ছিল। এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, পাপ থেকে মুক্তি, এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। রোজার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা, যা তাকওয়া অর্জনের মূল ভিত্তি।

রোজার গুরুত্ব হাদিসের আলোকে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদিসে আলোচনা করেছেন। একটি বিখ্যাত হাদিসে তিনি বলেছেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় রমজানের রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"
— (সহিহ বুখারি: ২০১৪, সহিহ মুসলিম: ৭৬০)

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট যে, রোজা শুধু আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের একটি মাধ্যম নয়, বরং এটি অতীতের গুনাহ মাফের একটি সুযোগ।

আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

“আল্লাহ বলেন: আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোজা আমার জন্য, এবং আমি এর প্রতিদান দেব।”

— (সহিহ বুখারি: ১৯০৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫১)

এই হাদিসে রোজার অনন্য ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রোজা এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহ সরাসরি নিজের জন্য বলে ঘোষণা করেছেন। এর অর্থ হলো, এর প্রতিদান এত মহান যা আল্লাহ নিজে নির্ধারণ করবেন।

রোজার প্রাসঙ্গিকতা

রোজা ইসলামের একটি মৌলিক বিধান, যা আধ্যাত্মিক, শারীরিক এবং সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

রোজা আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। রোজার মাধ্যমে একজন মুসলিম নিজের নফসকে সংযত করে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

“আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোজা আমার জন্য, এবং আমি নিজে এর প্রতিদান দেব।”

— (সহিহ বুখারি: ১৯০৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫১)

এ হাদিসে আল্লাহ রোজাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। রোজাদার ব্যক্তি তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং কুপ্রবৃত্তিকে সংযত রাখার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

শারীরিক ও মানসিক প্রাসঙ্গিকতা

রোজা কেবল আধ্যাত্মিক ইবাদত নয়; এটি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে রোজার মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত বিষাক্ত উপাদান বের হয়ে যায় এবং দেহের বিপাক প্রক্রিয়া উন্নত হয়। মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে রোজা একজন ব্যক্তিকে ধৈর্য, সংযম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الصِّيَامُ جُنَّةٌ.

“রোজা হলো একটি ঢাল।”

— (সহিহ বুখারি: ১৮৯৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫১)

এই হাদিসে রোজাকে ঢাল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা মানুষকে কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করে।

সামাজিক গুরুত্ব

রোজা সমাজে সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি অনন্য মাধ্যম। এটি মুসলিমদেরকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করতে শেখায় এবং তাদের প্রতি সহমর্মী হতে উদ্বুদ্ধ করে। রমজান মাসে দান-সদকা ও জাকাত দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

“যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করায়, সে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, তবে এতে রোজাদারের সওয়াবে কোনো কমতি হবে না।”

— (সহিহ তিরমিজি: ৮০৭)

এই হাদিস সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পরোপকারের গুরুত্ব তুলে ধরে।

আখিরাতের জন্য গুরুত্ব

রোজা কেবল দুনিয়ার জীবনে নয়, আখিরাতেও বিশেষ মর্যাদা লাভের মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ.

“জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম আর-রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে কেবল রোজাদাররাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না।”

— (সহিহ বুখারি: ১৮৯৬, সহিহ মুসলিম: ১১৫২)

এই হাদিস রোজাদারদের জন্য জান্নাতে বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষণা করে।

রোজার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রোজা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি এবং তা আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। এটি শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকার একটি নিয়ম নয়; বরং রোজার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম রোজার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠনের যে মহান শিক্ষা প্রদান করে, তা কুরআন ও হাদিসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রোজার লক্ষ্য

১. তাকওয়া অর্জন:

তাকওয়া অর্থ হলো আল্লাহভীতি এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা। রোজার মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর প্রতি আরো আনুগত্যশীল করা এবং পাপ থেকে দূরে রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

তাকওয়া অর্জনের জন্য রোজা মানুষকে তার ইন্দ্রিয় এবং নফসের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সাহায্য করে। রোজা শুধুমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থেকে বিরত থাকা নয়; বরং এটি অন্তর ও আচরণের পরিশুদ্ধি সাধনের জন্য এক বিশেষ প্রশিক্ষণ।

২. আত্মশুদ্ধি ও পাপ মোচন:

রোজা একজন মুমিনকে তার অতীতের পাপ থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায় রমজানের রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"

— (সহিহ বুখারি: ২০১৪, সহিহ মুসলিম: ৭৬০)

রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর কাছে তার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে সৎপথে চলার প্রতিজ্ঞা করে।

৩. ধৈর্য ও সংযমের শিক্ষা:

রোজা মানুষের ধৈর্য এবং সংযমশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ.

"রোজা হলো একটি ঢাল।"

— (সহিহ বুখারি: ১৮৯৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫১)

এটি রোজাকে শয়তানের প্ররোচনা এবং মন্দ কাজ থেকে রক্ষার মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেছে। একজন রোজাদার দিনের বেলায় খাবার ও পানীয় থেকে বিরত থেকে তার নফসকে সংযত রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকে।

রোজার উদ্দেশ্যঃ

রোজা ইসলামিক জীবনযাত্রার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা শুধু খাদ্য বা পানীয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের আত্মাকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের সৎকর্মে অংশগ্রহণ করে। রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি, ধৈর্য ও আত্মসংযম অর্জন, এবং মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও দানে উৎসাহিত করা। নিচে রোজার উদ্দেশ্যগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো, হাদিসসহ।

তাকওয়া অর্জন

রমজান মাসের রোজা রাখার মাধ্যমে মুসলমানদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে **তাকওয়া অর্জন**। তাকওয়া হলো আল্লাহর প্রতি ভীতি, তাঁর আদেশ পালন করার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করা, এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা। কুরআনে আল্লাহ তাআলা রোজার উদ্দেশ্য হিসেবে তাকওয়া অর্জনকে উল্লেখ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে যারা বিশ্বাস করো! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন পূর্ববর্তী জাতির উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিমের লক্ষ্য হলো তার জীবনে তাকওয়া সৃষ্টি করা, যা তাকে আল্লাহর নিকট আরও নিকটে নিয়ে যায়। রোজা তার সমস্ত খারাপ অভ্যাস ও গোনাহ থেকে বিরত রাখে, এবং সে আল্লাহর প্রতি আরও বেশি আস্থা ও ভরসা রাখে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
"যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশা নিয়ে রমজান মাসের রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ মাফ করা হয়।"
— (সহিহ বুখারি)
এই হাদিসটি নিশ্চিত করে যে, রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং তার সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়, যা তার তাকওয়া অর্জনে সহায়ক হয়।

আত্মসংযম ও ধৈর্য

রোজা রাখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো **আত্মসংযম** এবং **ধৈর্য** অর্জন। রোজা মানুষের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি এবং আত্মসংযম গড়ে তোলে, যা তার নৈতিক চরিত্রকে শক্তিশালী করে। রোজার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার দৈহিক প্রয়োজনীয়তা এবং ইন্দ্রীয় বাসনা থেকে বিরত থাকে, যা তার জীবনে ধৈর্য, সহ্যশক্তি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস তৈরি করে।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَصَابَرَ فِي رَمَضَانِ فَجَزَاؤُهُ عَلَى اللهِ
"যে ব্যক্তি রমজান মাসে ধৈর্য ধারণ করে, তার পুরস্কার আল্লাহ তাআলা নিজেই দেবেন।"
— (সহিহ মুসলিম)
এটি বর্ণিত যে, রোজা রাখার সময় একটি মুসলিম নিজের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করে এবং সকল প্রকারের খারাপ অভ্যাস, যেমন অশ্লীলতা, মিথ্যা বলা, এবং অন্য সকল পাপাচার থেকে বিরত থাকে।
এছাড়া, কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:
وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
"এবং ধৈর্য ধর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"
— (সূরা আল-আল ইমরান: ২০০)

আল্লাহর প্রতি আনুগত্য

রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো **আল্লাহর প্রতি আনুগত্য** প্রকাশ করা। একজন মুসলিম রোজা রাখে শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিমের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং সে জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের দিকে পরিচালিত হয়।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
رَمَضَانُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ
"রমজান মাস হলো আগুন থেকে রক্ষার একটি ঢাল।"
— (সহিহ মুসলিম)

এই হাদিসটি প্রদর্শন করে যে, রোজা রাখা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং এটি আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

"অতঃপর মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা দাও, তারা তাতে আসবে।"

— (সূরা আল-হজ: ২৭)

এ আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রোজা এবং অন্যান্য ইবাদত ইসলামে আল্লাহর আনুগত্যের অন্যতম মাধ্যম, যা আল্লাহর প্রতি ন্যায্য ভক্তির প্রকাশ। রোজা দিয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়, যা একজন মুসলিমের জীবনে ঈমানের শক্তি বাড়ায়।

মানুষের মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধি

রোজার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো **মানুষের মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধি করা**। রোজা মানুষকে গরিব, দুঃখী এবং অভাবীদের অবস্থা অনুভব করার সুযোগ দেয়। যেহেতু রোজাদাররা পুরো দিন খাবার এবং পানীয় থেকে বিরত থাকে, তারা বুঝতে পারে যে, দুঃস্থ মানুষদের জন্য কতটা কষ্টের জীবন কাটাতে হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَفَطَّرَ اللَّهُ فِي جَنَّتِهِ

"যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতে পানি পান করাবেন।"

— (ইবনে মাজাহ)

এটি মানুষকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার এবং গরিবদের সহায়তা করার উৎসাহ দেয়। রোজা মানুষের হৃদয়ে দানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের সমাজের অসহায় এবং দরিদ্র মানুষের সহায়তা করতে পারে।

এছাড়া, কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَفَجَّرْنَا لَهُ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَتْ

"অতঃপর আমরা তার জন্য সাগরকে ফাটিয়ে দিয়েছি।"

— (সূরা আনফাল: ১২)

এটি মানবতার প্রতি আল্লাহর দয়ার একটি নিদর্শন, যা রোজার মাধ্যমে আরও সুস্পষ্ট হয়। রোজা একজন মুসলিমকে দান ও সহানুভূতির দিকে এগিয়ে নিয়ে আসে, যা সমাজে শান্তি ও সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

রোজা শুধুমাত্র একটি শারীরিক অভ্যাস নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক ইবাদত। রোজার মাধ্যমে একজন মুসলিম **তাকওয়া** অর্জন করে, **আত্মসংযম** ও **ধৈর্য** তৈরি করে, আল্লাহর প্রতি **আনুগত্য** প্রকাশ করে এবং মানুষের মধ্যে **সহানুভূতি** বৃদ্ধি পায়। এটি তাকে তার জীবনকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে, এবং সমাজে শান্তি ও সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করে।

রোজার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন: **الصَّوْمُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ** "রোজা একটি ঢাল। সুতরাং যদি তোমাদের কেউ রোজা রেখে অশালীনতা বা গালাগালি করে, তবে তাকে বলো, আমি রোজাদার।"

— (সহিহ বুখারি: ১৯০৪)

এখানে রোজার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা, ধৈর্য, ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করা। রোজা মানুষকে শুধুমাত্র খাওয়া ও পানীয় থেকে বিরত রাখতে শেখায় না, বরং সকল অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়, যার মাধ্যমে একটি সৎ জীবনযাপন গঠন সম্ভব হয়।

রোজার বিধান ও গুরুত্ব

রোজা ইসলামিক ধর্মীয় বিধান হিসেবে কুরআন ও হাদিসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে রোজার ফরজ বিধান তুলে ধরেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন পূর্ববর্তী জাতির উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোজাকে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ করেছেন। এটি শুধু একটি শারীরিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ। রোজা রাখার মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে পারে এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে পারে।

রোজার প্রকৃতি

রোজা হচ্ছে এমন একটি ইবাদত যা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে, নির্দিষ্ট শর্তে পালন করতে হয়। সাধারণত রোজার সময় খাদ্য, পানীয়, যৌন সম্পর্ক এবং অন্যান্য কিছু নির্দিষ্ট আচরণ থেকে বিরত থাকতে হয়। রোজার সময় সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুসলিমরা খাদ্য গ্রহণ বা পানীয় পান করতে পারে না। এর পাশাপাশি মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, রাগান্বিত হওয়া, এবং অসত্য আচরণ থেকেও বিরত থাকতে হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও মন্দ কাজ করা ছেড়ে দেয় না, তার জন্য আল্লাহর কাছে রোজা রাখার কোন উপকারিতা নেই।”

— (সহিহ বুখারি: 1903)

অর্থাৎ রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা অর্জন করা এবং শুধু খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে নয়, বরং মন্দ কাজ ও খারাপ আচরণ থেকেও বিরত থাকা।

রোজার নিয়মাবলী

রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ, তবে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত আছে যার অধীনে রোজা রাখা ফরজ হয়। রোজার নিয়মাবলী নিম্নরূপ:

1. **সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাবার এবং পানীয় থেকে বিরত থাকা।**
2. **যৌন সম্পর্ক থেকেও বিরত থাকা।**
3. **নফল রোজার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত শর্ত ও প্রক্রিয়া কিছুটা আলাদা হতে পারে, তবে ফরজ রোজার জন্য যে নিয়মাবলী প্রযোজ্য, তা অবশ্যই পালন করতে হয়।**

রোজার ফজিলত ও উপকারিতা

১. আত্মিক পরিশুদ্ধি

রোজার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা। রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুমিন নিজেকে শুদ্ধ করে এবং তাকওয়া অর্জন করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় রমজানের রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"

— (সহিহ বুখারি: ২০১৪, সহিহ মুসলিম: ৭৬০)

২. শারীরিক উপকারিতা

রোজা শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই নয়, শারীরিক উন্নতির জন্যও উপকারী। আধুনিক বিজ্ঞানও এটি প্রমাণ করেছে যে, রোজা দেহের টক্সিন বের করে এবং বিপাক প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তোলে। এর ফলে শরীরের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা যেমন ঘটে, তেমনি এটি মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

৩. সামাজিক সংহতি

রোজার মাধ্যমে সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। রোজা রাখার কারণে ধনী ও গরিবের মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। মুসলিমরা রোজা রাখার মাধ্যমে গরিবদের সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা পায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

"যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করায়, সে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, তবে এতে রোজাদারের সওয়াবে কোনো কমতি হবে না।"

— (তিরমিজি: ৮০৭)

৪. আখিরাতের পুরস্কার

রোজাদারদের জন্য আল্লাহ তাআলা আখিরাতে বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জান্নাতে তাদের জন্য একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যার নাম "আর-রাইয়ান", যেখান দিয়ে শুধুমাত্র রোজাদাররা প্রবেশ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ.

"জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম আর-রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে কেবল রোজাদাররাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

— (সহিহ বুখারি: ১৮৯৬, সহিহ মুসলিম: ১১৫২)

রোজার শর্তাবলী

রোজা ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

1. **মুমিন হওয়া:** রোজা শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য ফরজ।
2. **বুঝতে সক্ষম হওয়া:** শিশুদের জন্য রোজা ফরজ নয়, যতক্ষণ না তারা বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হয়।
3. **স্বাস্থ্যবান হওয়া:** যারা অসুস্থ, অথবা যারা দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন, তাদের জন্য রোজা রাখা শিথিল।
4. **যাত্রা না করা:** যদি কোনো মুসলিম দীর্ঘ সফরে থাকে, তবে তাকে রোজা না রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে পরবর্তী সময়ে তা আদায় করতে হবে।

রোজা ইসলামের একটি মহান ইবাদত যা শুধু খাদ্য বা পানীয় থেকে বিরত থাকা নয়, বরং একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিশুদ্ধ এবং উন্নত করার একটি বিশেষ মাধ্যম। রোজার মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে, আত্মশুদ্ধি লাভ করে, এবং আখিরাতে বিশেষ পুরস্কারের যোগ্য হয়ে ওঠে। এই ইবাদত ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে এবং আল্লাহর কাছে একান্তভাবে মঙ্গল প্রাপ্তির পথ তৈরি করে।

রোজার গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য

রোজার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন পূর্ববর্তী জাতির উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এটি একজন মুসলিমকে তার খারাপ অভ্যাসগুলো পরিহার করতে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে শুদ্ধ করার সুযোগ দেয়। রোজার মাধ্যমে একজন মুসলিমের আত্মিক পরিশুদ্ধি সাধিত হয় এবং তার জীবন উপকারিতা লাভ করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ.

“জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম আর-রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে কেবল রোজাদাররাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না।”
— (সহিহ বুখারি: ১৮৯৬, সহিহ মুসলিম: ১১৫২)
এটি রোজার আধ্যাত্মিক গুরুত্বের একটি বড় উদাহরণ, যা রোজাদারদের জন্য আল্লাহর বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

রোজার ভাষাগত অর্থ হলো "বিরত থাকা", এবং পরিভাষাগত অর্থ হলো আল্লাহর আদেশ পালন করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাওয়া-দাওয়া, যৌন সম্পর্ক এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। এটি একদিকে যেমন আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়, তেমনি অন্যদিকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপকারিতাও এনে দেয়। ইসলামে রোজা কেবল খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার জন্য নয়, বরং এটি একজন মুসলিমকে পুরোপুরি পবিত্র এবং আল্লাহর কাছে আরো নিকটবর্তী করার জন্য রাখা হয়।

বরকতময় রমাদান: দয়া, ক্ষমা ও মুক্তির পয়গাম

রমাদান মাস ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। এটি রহমত, মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। রমাদান মাসে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে।

রমাদানের বরকতপূর্ণ দিক

১. রহমত (দয়া):

রমাদানের প্রথম দশ দিন রহমতের সময়। এই সময় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি বিশেষ দয়া বর্ষণ করেন।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ.

(বায়হাকি, শুআবুল ঈমান)

অর্থ: "রমাদানের শুরুতে রহমত, মাঝে মাগফিরাত, এবং শেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি।"

২. মাগফিরাত (ক্ষমা):

রমাদানের মধ্যবর্তী দশ দিন আল্লাহ বান্দাদের পাপ ক্ষমা করে থাকেন। এটি এমন সময়, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(সহীহ বুখারি: ৩৮, সহীহ মুসলিম: ৭৬০)

অর্থ: "যে ব্যক্তি রমাদানে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশা নিয়ে রোজা রাখে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"

৩. মুক্তি (জাহান্নাম থেকে রক্ষা):

রমাদানের শেষ দশ দিন হলো মুক্তির সময়। এই সময় আল্লাহ বান্দাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ.

(সহীহ মুসলিম: ১০৭৯)

অর্থ: "রমাদানের প্রথম রাতে শয়তান ও জিনদের বন্দি করা হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।"

রমাদানের অন্যান্য ফজিলত

১. কুরআনের নাজিল:

রমাদান মাসে পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে।

আল-কুরআন:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৫)

অর্থ: "রমাদান সেই মাস যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক এবং সৎপথের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা।"

২. লাইলাতুল কদর:

রমাদানের শেষ দশকে রয়েছে লাইলাতুল কদর, যা এক হাজার মাসের ইবাদতের সমান।

আল-কুরআন:

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

(সূরা আল-কদর, আয়াত ৩)

অর্থ: "লাইলাতুল কদর এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।"

রমাদানে করণীয় আমল

১. সিয়াম পালন:

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোজা রাখা।

২. তারাবিহ নামাজ:

রাতের বিশেষ নামাজ যা কুরআনের তেলাওয়াত শোনার জন্য।

৩. দোয়া ও ইস্তিগফার:

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও বিশেষ দোয়া করা।

৪. জাকাত ও সদকা:

গরীব-দুঃখীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো।

৫. লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান:

রমাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে বিশেষ ইবাদতে মগ্ন হওয়া।

রমযান মাস : আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মাগফিরাত লাভের এ অবারিত সুযোগ কাজে লাগাই

রমযান মাস। এখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয়েছে। শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষক ঘোষণা করছে-

يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ.

ওহে কল্যাণ-অন্বেষী! নেকীর পথে তুমি আরো অগ্রসর হও। ওহে অকল্যাণের পথিক! তুমি নিবৃত্ত হও, নিয়ন্ত্রিত হও। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৮২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪২

চারিদিকে কেবল ক্ষমা ও মাগফিরাতের ঘোষণা- রোযা রাখো, পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেব। তারাবী-তাহাজ্জুদ আদায় কর, ক্ষমা লাভে ধন্য হও। লাইলাতুল কদরে ইবাদত কর, মাগফিরাতের সাগরে অবগাহন কর।

ইফতারের সময় ক্ষমা করা হয়, রাতে ক্ষমা করা হয়, দিনে ক্ষমা করা হয়। চারিদিকে ক্ষমা ক্ষমা রব।

এমন সুযোগ যেন আমার হাতছাড়া না হয়। এজন্য সতর্ক হব রমযানের শুরুতেই।

রমযান শেষে আফসোস নয়; সচেতন হই শুরুতেই

রমযানের একেবারে শেষ প্রহরে আমরা আফসোস করে বলি- হায়, রমযান চলে গেল, কিছুই করতে পারলাম না; জানি না- মাগফিরাতের নিআমত লাভ করতে পারলাম কি না! সুতরাং শুরুতেই সচেতন হই, সাধ্যমতো কাজে লাগাই রমযানকে। (যদিও আল্লাহর নেক বান্দারা সাধ্যমতো আমল করার পরও আফসোস করেন।) স্মরণ রাখি নবীজীর এ হাদীস। জাবের রা. থেকে বর্ণিত-

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَقَى الْمِنْبَرَ، فَلَمّا رَقَى الدّرَجَةَ الْأُولَى قَالَ :آمِينَ، ثُمّ رَقَى الثّانِيَةَ فَقَالَ :آمِينَ، ثُمّ رَقَى الثّالِثَةَ فَقَالَ :آمِينَ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ :آمِينَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ؟ قَالَ :لَمّا رَقِيتُ الدّرَجَةَ الْأُولَى جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ :شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَه ، فَقُلْتُ :آمِينَ....

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে আরোহণ করলেন। প্রথম ধাপে উঠে বললেন, আমীন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে উঠেও বললেন, আমীন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসূল! আপনাকে (এভাবে) তিনবার আমীন বলতে শুনলাম?

তখন নবীজী বললেন, আমি যখন মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করলাম তখন জিবরীল আগমন করলেন এবং বললেন, ঐ ব্যক্তি হতভাগা, যে রমযান মাস পেল, আর রমযান গত হয়ে গেল, কিন্তু তার গুনাহ মাফ হল না। আমি বললাম, আমীন।... -আলআদাবুল মুফরাদ, বুখারী, হাদীস ৬৪৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭৪৫১

নবীজী তো কখনো আমাদের ধ্বংস চাইবেন না; তিনি চেয়েছেন- এমন অবারিত সুযোগকে যেন আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করি। তাই আসুন, রমযানের শুরুতেই পরিকল্পনা গ্রহণ করি। রমযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে একে যথাযথ কাজে লাগাই।

রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

রোযার মাধ্যমে পূর্বের সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়

রমযান মাসের রোযা এতটা মহিমান্বিত একটি আমল, যার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِه.

যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাব তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সওয়াবের প্রত্যাশা রেখে রমযান মাসে রোযা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮

রোযার প্রতিদান আল্লাহ নিজে দেবেন

আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দার রোযা অত্যন্ত প্রিয়। এর প্রতিদান আল্লাহ নিজে দেবেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّه ُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَه ُ وَطَعَامَه ُ مِنْ أَجْلِي.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা; কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পানাহার থেকে বিরত থাকে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৭১৪

আমার রোযা যেন আমার জন্য ঢাল হয়

হাদীস শরীফে রোযাকে ঢাল বলা হয়েছে। জাহান্নাম থেকে ঢাল। তবে আমার দায়িত্ব এ ঢালকে অক্ষুণ্ন রাখা; বিদীর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা করা। ইরশাদ হয়েছে-

الصّومُ جُنّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا.

রোযা ঢাল স্বরূপ, যতক্ষণ না তা বিদীর্ণ করে ফেলা হয়। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯০

আরেক বর্ণনায় এসেছে, নবীজীকে জিজ্ঞেস করা হল, কীভাবে তা বিদীর্ণ হয়? নবীজী বললেন-

بِكَذِبٍ، أَوْ غِيبَةٍ.

মিথ্যা অথবা গীবতের মাধ্যমে। -আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৪৫৩৬

হাদীস শরীফে আরো এসেছে-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে মিথ্যা কথা ও কাজ এবং মূর্খসুলভ আচরণ ছাড়ল না, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০৫৭

রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক প্রিয়

রোযাদার ব্যক্তি দিনভর উপোস থাকে। অনাহারে থাকার দরুন তার মুখে একধরনের দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। দুনিয়াবি বিবেচনায় তা দুর্গন্ধ মনে হলেও রাব্বুল আলামীনের নিকট তা মেশকের চেয়েও প্রিয়। নবীজী বলেন-

وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ.

ঐ সত্তার কসম, যার কব্জায় মুহাম্মাদের প্রাণ, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধি থেকেও প্রিয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৪

রোযাদারের জন্য রয়েছে বিশেষ আনন্দের মুহূর্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لِلصّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.

রোযাদারের জন্য দুটি বিশেষ আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি হল, ইফতারের সময়। অপরটি হল, যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে (আর তিনি তাকে বিশাল পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করবেন)। -সহীহ মুসলিম, হাদীস **১১৫১**

রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না

রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট এতটাই মহব্বতের পাত্র যে, সে কিছু চাইলে আল্লাহ তা ফিরিয়ে দেন না। নবীজী বলেন-

ثَلَاثَةٌ لاَ تُرَدّ دَعْوَتُهُمْ: الصّائِمُ حَتّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السّمَاءِ وَيَقُولُ الرّبّ: وَعِزّتِي لأَنْصُرَنّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না :

এক. রোযাদারের দুআ ইফতার পর্যন্ত।

দুই. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ।

তিন. মজলুমের দুআ। আল্লাহ এ দুআকে মেঘমালার উপরে নিয়ে যান। এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেন। রব বলেন, আমার ইযযতের কসম, বিলম্বে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস **১৭৫২**; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৭৪৩

রোযাদারের জন্য রোযা সুপারিশ করবে

কিয়ামতের দিন রোযাদারের জন্য রোযা নিজে সুপারিশ করবে। হাদীসে এসেছে-

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطّعَامَ وَالشّهَوَاتِ بِالنّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النّوْمَ بِاللّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفّعَانِ.

কিয়ামতের দিন সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, ওগো রব! দিবসে আমি তাকে পানাহার ও (বৈধ) জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে নিবৃত্ত রেখেছি। তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, রাতে আমি তাকে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬২৬; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস ৫০৮১

রোযাদারের জন্য থাকবে জান্নাতের বিশেষ তোরণ

রোযাদার হলেন আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহমান। জান্নাতে প্রবেশের জন্য তার সৌজন্যে বিশেষ তোরণের ব্যবস্থা থাকবে। নবীজী বলেন-

إِنّ فِي الجَنّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرّيّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ،
يُقَالُ: أَيْنَ الصّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে। নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন তা দিয়ে রোযাদাররা প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে, রোযাদাররা কোথায়?

তখন তারা আসবে। তারা ছাড়া তা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না। রোযাদাররা প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আর কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করবে না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫২

সাহরী খাই, বরকত লাভ করি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

تَسَحّرُوا فَإِنّ فِي السّحُورِ بَرَكَةً.

তোমরা সাহরী কর। কেননা সাহরীর খাবারে বরকত রয়েছে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯২৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৯৫

শেষ ওয়াক্তে সাহরী গ্রহণ করা উত্তম

সাহরী করা যেমন মুস্তাহাব তেমনি তা ওয়াক্তের শেষ দিকে করাও উত্তম। অর্থাৎ সতর্কতামূলক সময় হাতে রেখে সুবহে সাদিকের পূর্ব-নিকটবর্তী সময়ে সাহরী করা ভালো। নবীজী বলেন-

إِنّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُؤَخِّرَ سَحُورَنَا.

আমরা নবীগণ এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে, সময় হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করব এবং শেষ ওয়াক্তে সাহরী গ্রহণ করব। -আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ১৮৮৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৪৮৮০

সময় হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করি

এতক্ষণ আল্লাহর হুকুম ছিল খাবে না। এখন সূর্য অস্ত গিয়েছে। এখন তাঁর হুকুম ইফতার করা। তাই আর দেরি নয়, জলদি জলদি ইফতার শুরু করে দিন।

পূর্বে উল্লেখ হয়েছে দ্রুত ইফতার করা ছিল নবীগণের বৈশিষ্ট্য। সাহাবায়ে কেরামও দ্রুত ইফতার করতেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لاَ يَزَالُ النّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجّلُوا الفِطْرَ.

মানুষ ততদিন খায়ের ও কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন তারা সময় হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত ইফতার করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৯৮

ইফতারের আগের দুআ থেকে গাফেল না থাকি; এসময় দুআ কবুল হয়

পুরো রমযানই রহমত-মাগফিরাতের মাস। তবে কিছু কিছু মুহূর্তে বান্দার প্রতি তা প্রবল বেগে ধাবিত হয়। ইফতারের সময়টিও এমন। তাই এ সময়ের দুআ আল্লাহ পাক বিশেষভাবে কবুল করেন। নবীজী বলেন-

إِنّ لِلصّائِمِ عِنْدَ فِطْرِه ِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدّ.

ইফতারের সময় রোযাদারের অন্তত একটি দুআ এমন, যা ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭৫৩

অর্থাৎ কমপক্ষে একটি দুআ অবশ্যই কবুল হয়। সুতরাং এসময় নিজে দুআ করি, ঘরের নারীদেরও শরীক করি।

ইফতারের দুআ পড়ি

ইফতারের সময় হাদীস শরীফে এ দুআ পড়ার কথা এসেছে-

اللهم لَكَ صُمْتُ، وعلى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

আয় আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রোযা রেখেছি এবং আপনার রিযিক দিয়েই ইফতার করেছি। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৫৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯৭৪৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার গ্রহণ করে এই দুআও পড়তেন-

ذَهَبَ الظّمَأُ وَابْتَلّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

পিপাসা নিবারিত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল। আর আল্লাহ চাহেন তো সওম-এর সওয়াব প্রাপ্তির খাতায় লিপিবদ্ধ হল। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৫৭; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৩৩১৫

রোযাদারকে ইফতার করাই

রোযাদারকে ইফতার করানো অনেক বড় সওয়াবের আমল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ فَطّرَ صَائِمًا كَانَ لَه ُ مِثْلُ أَجْرِه ِ ، غَيْرَ أَنّه ُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصّائِمِ شَيْئًا.

কেউ যদি কোনো রোযাদারকে ইফতার করায় তাহলে সে ঐ রোযাদারের সমান সওয়াব লাভ করবে। আর এতে ঐ রোযাদারের সওয়াবে কোনো কম করা হবে না। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৮০৭

নিয়মিত তারাবী আদায় করি

রমযান মাসের বিশেষ একটি আমল হচ্ছে তারাবীর নামায আদায় করা। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য তা সুন্নতে মুআক্কাদাহ।

তারাবীতে কালামুল্লাহ্র সাথে বান্দার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এর মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মাফ হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِه ِ.

যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাব তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে কিয়ামে রমযান আদায় করবে তার বিগত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০০৯

সাহরীর জন্য একটু আগে উঠি : তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করি

তাহাজ্জুদ অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। কুরআনে কারীমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাজ্জুদের বিশেষ হুকুম করা হয়েছে। তাহাজ্জুদের সময় তথা রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর রহমত বান্দার প্রতি নিবিষ্ট থাকে।

এসময় বান্দার উচিত রবের ডাকে সাড়া দিয়ে তাহাজ্জুদের সালাতে মশগুল হওয়া। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَفْضَلُ الصّلَاةِ بَعْدَ الصّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصّلَاةُ فِي جَوْفِ اللّيْلِ.

ফরয নামাযের পর মধ্যরাতের নামায সর্বোত্তম। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৩

রমযানের এক মাস যদি সাহরীতে একটু আগে উঠে নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করি, তাহলে বাকি এগারো মাস সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে- ইনশাআল্লাহ।

রমযান কুরআন নাযিলের মাস : কুরআনের সাথেই কাটুক রমযান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ .

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়েতের দিশারী, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের যে এ মাস লাভ করবে, সে যেন তাতে অবশ্যই রোযা রাখে। -সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

সুতরাং রমযানে রুটিন করে কুরআন তিলাওয়াত করি; নিজ পরিবার ও পরিবেশে প্রতিযোগিতার সাথে কুরআন তিলাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করি। ঘরের নারীদের তিলাওয়াতের সময় বের করতে সাহায্য করি।

রমযানে আকাবির-আসলাফের তিলাওয়াতের ঘটনাগুলো জানতে ও আমল করতে চেষ্টা করি।

এ সংখ্যায়ও একেন্দ্রিক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রয়েছে। সেটি অবশ্যই পড়তে চেষ্টা করি।

তিলাওয়াতের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত নির্ভরযোগ্য কোনো তাফসীর থেকে অল্প অল্প পড়তে চেষ্টা করি। যাদের এখনো সহীহ-শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শেখার সুযোগ হয়নি, তারা রমযান থেকেই এ মেহনত শুরু করি।

লাইলাতুল কদর : এ নিআমত লাভে ধন্য হই

রমযানের পুরো মাস জুড়ে বিরাজ করে রহমত ও ক্ষমার ঘোষণা। তবে এ মাসে রয়েছে বিশেষ এক মহিমান্বিত রজনী- লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তাআলা এ রাতের ব্যাপারে বলেন-

لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ ۙ۬ خَيۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ ؕ﴿۳﴾ تَنَزَّلُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ وَ الرُّوۡحُ فِيۡهَا بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ ۚ مِنۡ کُلِّ اَمۡرٍ ۙ﴿۴﴾ سَلٰمٌ ۟ۛ هِیَ حَتّٰی مَطۡلَعِ الۡفَجۡرِ.

কদর রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই রজনীতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতরণ করেন প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সেই রজনী সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত। -সূরা কদর (৯৭) : ৩-৫

সুতরাং আল্লাহর দেওয়া এ মহা নিআমত ও পুরস্কার লাভে সচেষ্ট হই। **নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-**

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

...যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাব তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সওয়াব প্রাপ্তির আশায় লাইলাতুল কদরে কিয়াম (নামায-ইবাদত-বন্দেগী) করবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১৪

লাইলাতুল কদর থেকে বঞ্চিত হওয়া অনেক বড় মাহরূমী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এত বড় খোশখবরী পাওয়ার পর এ রাতের ক্ষমা ও রহমত লাভের চেষ্টা না করা অনেক বড় বঞ্চনার বিষয়। **আনাস রা. বলেন, রমযান এলে নবীজী বলতেন-**

إِنّ هَذَا الشّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلّا مَحْرُومٌ.

এই মহিমান্বিত মাস উপস্থিত। তাতে একটি রজনী রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হল, সে যেন সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হল। আর কেবল অভাগাই এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২১০৬

সুতরাং হেলায় না কাটিয়ে কদরের রাতের কদর করি।

যেভাবে লাভ করতে পারি শবে কদর

কীভাবে শবে কদর লাভ করতে পারি- এবিষয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

تَحَرّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

তোমরা রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর তালাশ কর। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২০

আরেক বর্ণনায় এসেছে-

الْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوَتْرِ.

তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে কদর অন্বেষণ কর। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১৬

শবে কদরের ন্যূনতম ফযীলত থেকে যেন বঞ্চিত না হই

মুমিনমাত্রেরই কর্তব্য হল, কদর রজনীর পূর্ণ কদর করা। অন্তত এ রাতে বিলকুল গাফেল না থাকা। রমযান মাসের ফরয নামাযগুলো জামাতের সাথে আদায় করার মাধ্যমে কদর রজনীর ন্যূনতম কদর হতে পারে। হাদীস শরীফে এসেছে-

যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতে আদায় করল সে যেন অর্ধ রজনী কিয়াম করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাযও জামাতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত নামায পড়ল। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫৬

শবে কদরে কী দুআ করব?

আম্মাজান আয়েশা রা. নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি আমি জানতে পারি, আজ লাইলাতুল কদর, তাহলে আমি কী দুআ করতে পারি?

নবীজী বললেন, তুমি বল-

اللهم إِنّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

আয় আল্লাহ! আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করতেই ভালবাসেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫১৩

শেষ দশকে ইতিকাফ করতে চেষ্টা করি

রমযানের ত্রিশ দিনের শেষ দশ দিন অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। রমযানের একটি বিশেষ আমল হচ্ছে সুন্নত ইতিকাফ। তা আদায় করার সময় এটি। রমযানের খায়ের-বরকত লাভে ইতিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর লাভ করার সম্ভাবনাও বেশি। তাই নবীজী রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফ করতেন।

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন-

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتّى تَوَفّاهُ اللهُ عَزّ وَجَلّ، ثُمّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। নবীজীর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করতেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৭২; সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৬

সদাকাতুল ফিতর আদায় করি : রোযায় ঘটে যাওয়া ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করি

আল্লাহ তাআলার হুকুমে বান্দা পুরো মাস রোযা রেখেছে। আল্লাহ যেভাবে হুকুম করেছেন সেভাবে রাখতেই চেষ্টা করেছে। রোযা রাখতে গিয়ে যে টুকটাক ভুল হয়ে যায় তার কাফফারা স্বরূপ সদাকাতুল ফিতরের বিধান দেওয়া হয়েছে। **ইবনে আব্বাস রা. বলেন-**

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصّائِمِ مِنَ اللّغْوِ وَالرّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدّاهَا قَبْلَ الصّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدّاهَا بَعْدَ الصّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصّدَقَاتِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিতরের বিধান দান করেছেন রোযাদারকে অর্থহীন ও অশ্লীল কথা-কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের

খাবারের ব্যবস্থা হিসাবে। যে ব্যক্তি তা (ঈদের) নামাযের আগে আদায় করবে সেটা গ্রহণযোগ্য সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যে নামাযের পর আদায় করবে সেটা সাধারণ সদকা হিসেবে বিবেচিত হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬০৯

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, যার মালিকানায় মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য সমপরিমাণ সম্পদ রয়েছে, তার ওপর সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। প্রত্যেকে তার নিজের পক্ষ থেকে এবং নাবালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে সদাকাতুল ফিতর আদায় করবে।

অতএব নিজের রোযাকে পরিশুদ্ধ করতে ঈদের নামাযে যাওয়ার আগেই সদাকাতুল ফিতর আদায় করি।

শাওয়ালের ছয় রোযা

রমযানের পরবর্তী আরবী মাস হচ্ছে শাওয়াল। পয়লা শাওয়াল ঈদের দিন। এরপর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখার চেষ্টা করি। এ রোযার ফযীলত অনেক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখল। এরপর শাওয়ালে ছয়টি রোযা রাখল। সে পুরো বছর রোযা রাখার সওয়াব লাভ করবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৪

মাহে রমাদানে কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা মাহে রমযানের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ.
রমযান তো সেই মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। -সূরা বাকারা (০২) : ১৮৫
এজন্য কুরআন নাযিলের সূচনালগ্ন থেকেই মাহে রমযানের সাথে কুরআন কারীমের একটা গভীর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর ওপর এই পবিত্র কালামুল্লাহ নাযিল হয়েছে, মাহে রমযানের আগমন ঘটলে তাঁর স্বাভাবিক জীবনাচারে পরিবর্তন ঘটত। দান-সদকাসহ অন্যান্য নেক আমলের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রমযানের প্রতি রাতে জিবরাঈল আ. অবতরণ করতেন। একজন আরেকজনকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। সে সময়টায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে যেই অবস্থা তৈরি হত, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে দানশীল। মাহে রমযানে তিনি আরো বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন। বিশেষত যখন জিবরীল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। জিবরীল আ. মাহে রমযানের প্রতি রাতে তাঁর কাছে আগমন করতেন এবং কুরআনের মুযাকারা করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা উন্মুক্ত বাতাসের চেয়েও বেড়ে যেত। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২২০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অবস্থাও এর ভিন্ন ছিল না। রমযান এলে তারা তাদের তিলাওয়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। বছরের অন্যান্য সময় যত দিনে কুরআন খতম করতেন, রমযানে তার চেয়ে কম সময়ে কুরআন খতম করতেন। পাশাপাশি তারাবীহ এবং কিয়ামুল লাইলে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের আমল জারি থাকত। সালাফে সালেহীন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের জীবনীতেও এমনটাই চোখে পড়ে। মাহে রমযানে তারা সকলেই কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। নমুনাস্বরূপ আমরা এখানে সালাফের জীবনী থেকে তিলাওয়াতের সেই জ্যোতির্ময় ধারাবাহিকতার কিছু চিত্র তুলে ধরছি-
বিখ্যাত তাবেয়ী আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রাহ. (ওফাত : ৭৫ হি.)
তিনি বছরের অন্যান্য সময়ও মাত্র ছয় দিনে কুরআন খতম করতেন। আর মাহে রমযানে প্রতি দুই রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। মাগরিব থেকে এশার মাঝামাঝি সময়ে

সামান্য বিশ্রাম করে নিতেন। এরপর সারা রাত আর ঘুমাতেন না। (দ্র. তবাকাতে ইবনে সা'দ, খ. ৮, পৃ. ১৯৫; কিতাবুস সিকাত, ইবনে হিব্বান, খ. ৪, পৃ. ৩১)

ইমরান ইবনে ইসাম আদদুবায়ী রাহ. (ওফাত : ৮৩ হি.)

তিনি মাহে রমযানে লোকদেরকে নিয়ে এলাকার মসজিদে নামায আদায় করতেন। প্রতি ৩ দিনে নামাযে একবার কুরআন খতম করতেন। (দ্র. তারীখে দিমাশক, খ. ৪৩, পৃ. ৫১৬)

ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. (ওফাত : ৯৬ হি.)

ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. থেকে বর্ণিত, রমযান মাসে তিনি তিন দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। শেষ দশকে দুই দিনে এক খতম করতেন। (দ্র. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক খ. ৪ পৃ. ২৫৪, বর্ণনা ৭৭০৫)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাতাদা ইবনে দিআমা রাহ. (ওফাত : ১১৭ হি.)

তিনি প্রতি ৭ দিনে একবার কুরআন কারীম খতম করতেন। রমযান মাসে প্রতি ৩ দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। শেষ দশকে প্রতিদিন এক খতম তিলাওয়াত করতেন। (দ্র. হিলইয়াতুল আউলিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৩৯)

ইবনে শিহাব যুহরী রাহ. (ওফাত : ১২৪ হি.)

রমযান মাস এলে ইবনে শিহাব যুহরী রাহ. বলতেন, এই মাস তো তিলাওয়াতের মাস। রোযাদারকে ইফতার করানোর মাস। (দ্র. আততামহীদ, ইবনে আব্দিল বার খ. ৬ পৃ. ১১১)

ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ. (ওফাত : ১৫০ হি.)

রমযান মাস এলেই ইমাম আবু হানীফা রাহ. কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সম্পূর্ণ ফারেগ হয়ে যেতেন। স্বাভাবিক সময়ে তিনি প্রতিদিন এক খতম তিলাওয়াত করতেন। রমযানে প্রতিদিন দুই খতম তিলাওয়াত করতেন। এভাবে ঈদুল ফিতরের রাত ও দিনসহ মাহে রমযানে সর্বমোট ৬২ বার কুরআন খতম করতেন। যখন রমযানের শেষ দশক শুরু হত, তখন তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ খুব কমই হত। (দ্র. আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ৫৫, ৫৭; তারীখে বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৫)

সুফিয়ান সাওরী রাহ. (ওফাত : ১৬১ হি.)

সুফিয়ান সাওরী রাহ. রমযান মাসে অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে কুরআন তিলাওয়াতেই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। (দ্র. লাতাইফুল মাআরিফ, ইবনে রজব হাম্বলী, পৃষ্ঠা ১৭১)

ইমাম মালেক রাহ. (৯৩-১৭৯ হি.)

ইমাম মালেক রাহ. রমযান মাসে হাদীসের দরস প্রদান থেকে এবং আহলে ইলমের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ থেকে বিরত থাকতেন। কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। (দ্র. লাতাইফুল মাআরিফ, ইবনে রজব হাম্বলী, পৃষ্ঠা ১৭১)

ইমাম ওয়াকী' ইবনুল র্জারাহ রাহ. (ওফাত : ১৯৭ হি.)

মাহে রমযানের দিনগুলো তিনি কীভাবে কাটাতেন, সে সম্পর্কে চমৎকার একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। 'মূসা ইবনে মুআবিয়া' নামে এক মাগরীবী আলেম বলেন, আমি একবার সফরে বের

হলাম। সে সময়টায় বাহলুল ইবনে রাশেদ থেকে বড় কোনো বুযুর্গকে দেখতে পাব বলে আমার ধারণা ছিল না। একপর্যায়ে ওয়াকী‘ ইবনুল র্জারাহ রাহ.-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তাঁর ব্যাপারে বলা হত, তিনি নাকি মাহে রমযানের রাত্রিগুলোতে পুরো কুরআন মাজীদ একবার খতম করে আরো এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ তিলাওয়াত করেন। মসজিদেই রাত্রিযাপন করেন। এরপর তাঁর ইতেকাফগাহে প্রবেশ করেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তাঁর ব্যাপারে যা বলা হয়, সেটা আজ রাতেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা তারাবীর নামায আদায় করলাম। এরপর দেখলাম, তিনি মসজিদপ্রাঙ্গণে বের হয়ে যাচ্ছেন। যখন আমরা বিতির নামায আদায় করলাম, তিনি তাঁর জায়গায় এসে ঢুকলেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি বসে বসে দেখছিলাম। তিনি প্রথমে সূরা ফাতেহা দিয়ে শুরু করলেন। এরপর সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করলেন। আমার চোখ লেগে আসছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। একপর্যায়ে যখন আমার ঘুম ভাঙল, ততক্ষণে রাতের বেশিরভাগ পেরিয়ে গেছে। দেখলাম, তিনি কুরআন কারীমের শেষের দিকের সূরাগুলো পাঠ করছেন।

আমি বসে থাকলাম। তিনি কুরআন খতম করলেন। এসময় তাঁর ছেলে একটা বাটিতে রুটি ও খেজুর, এক গ্লাস পানি নিয়ে প্রবেশ করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মাগরীবী সেই মুসাফির কোথায়?

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, আমাদের সাথে সাহরীতে অংশগ্রহণ করুন। তিনি খেলেন। আমিও তার সাথে খাবার গ্রহণ করলাম।

এরপর তিনি আবার নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সূরা বারাআহ পর্যন্ত কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর রুকু-সিজদাহ করে সালাম ফিরিয়ে আপন জায়গায় বসে থাকলেন। যখন ফযরের নামাযের ইকামাত হল, তিনি উঠে নামায আদায় করলেন। এরপর জায়নামাযে আসন গ্রহণ করলেন। আমি তাঁর শাগরিদদের সাথে তাঁর পাশে অবস্থান করছিলাম। বেলা ওঠার পর তিনি ১২ রাকাত চাশতের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি উঠে গেলেন। আধাদিন বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত হাদীসের দরস দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর জায়গায় শুয়ে পড়লেন।

যোহরের সময় তিনি উঠে গেলেন। মসজিদের নিকটবর্তী ওজুখানায় গিয়ে নামাযের জন্য ওজু করলেন মসজিদে গিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি আসর পর্যন্ত নফল নামায আদায় করতে থাকলেন। এভাবেই পুরো মাস অতিবাহিত হল। আমি পুরো মাস তাঁর সাথেই মসজিদে অবস্থান করেছিলাম। (দ্র. রিয়াযুন নুফূস, আবু বকর আলমালেকী, খ. ১, পৃ. ৩৭৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. ১২, পৃ. ১০৯)

ইমাম শাফেয়ী রাহ. (ওফাত : ২০৪ হি.)

তিনি প্রতি মাসে ৩০ বার কুরআন কারীম খতম করতেন। মাহে রমযানে ৬০ বার কুরআন খতম করতেন। দিনে এক খতম, রাতে এক খতম। তিনি যে শুধু তিলাওয়াত করে যেতেন,

এমনটি নয়; বরং কখনো কখনো এমন হত, তিনি কিয়ামুল লাইলে দাঁড়িয়েছেন। তখন এমন একটি আয়াত সামনে এল, যেটা ফিকহের কোনো অধ্যায় সম্পর্কিত। তিনি সালাম ফিরিয়ে বাতি জ্বালতেন এবং সেটা নোট করে রাখতেন। এরপর আবার বাতি নিভিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। দেখা যেত, এক রাতেই কয়েকবার এমনটি ঘটত। (দ্র. আদাবুশ শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু, ইবনে আবি হাতেম, পৃ. ৭৪; মানাকিবুশ শাফেয়ী, বাইহাকী, খ. ১, পৃ. ২৪৪, ২৭৯)

ইমাম বুখারী রাহ. (ওফাত : ২৫৬ হি.)

মাহে রমযানে তিনি বিভিন্নভাবে কুরআন খতম করতেন। রমযানের প্রথম রাতের সূচনা হল, তাঁর শাগরিদরা তাঁর কাছে এসে জড়ো হত। তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। প্রতি রাকাতে ২০ আয়াত করে তিলাওয়াত করতেন। এভাবে একটি খতম পূর্ণ হত। আবার সাহরীর সময় তিনি কুরআনের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন। এভাবে সাহরীর সময় প্রতি তিন রাতে একটি খতম হত। এছাড়াও দিনের বেলায় প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন। ইফতারের সময় সেই খতম সমাপ্ত হত। তিনি বলতেন, প্রত্যেক খতমের সময়টা হচ্ছে দুআ কবুল হওয়ার সময়। (দ্র. শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, খ. ২, পৃ. ৪১৬)

ইমাম নাসায়ী রাহ. (ওফাত : ৩০৪ হি.)

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব সুনানে নাসায়ী (নাসায়ী শরীফ)। এর সংকলক হলেন ইমাম নাসায়ী রাহ.। সাধারণ সময়ে তিনি প্রতিদিন একবার কুরআন মাজীদ খতম করতেন রমযানে প্রতি দিনে-রাতে দুইবার কুরআন খতম করতেন। (দ্র. মিরআতুয যামান, সিবত ইবনুল জাওযী খ. ১৬, পৃ. ৪২৯)

মুহাম্মাদ ইবনে উমর আলকুরতুবী রাহ. (ওফাত : ৩১৪ হি.)

তিনি পুরো রমযান মাসে ৬০ বার কুরআন কারীম খতম করতেন। (দ্র. আদদীবাজুল মুযহাব, খ. ২, পৃ. ১৯০)

খালাফ ইবনে মুহাম্মাদ রাহ. (ওফাত : ৩১৯ হি.)

তিনি নিয়মিত কিয়ামুল লাইলে কুরআনের এক-ষষ্ঠমাংশ তিলাওয়াত করতেন। এরপর রমযান এসে গেলে তিনি লোকদেরকে নিয়ে মসজিদে তারাবীর নামায আদায় করতেন। তাঁর কণ্ঠ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। একেবারে সাদামাটাভাবে তিলাওয়াত করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর তিলাওয়াত শুনে মুসল্লিদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যেত।

তারাবীহ শেষ হলে লোকেরা সবাই একে একে ঘরে ফিরে যেত। তিনি নিজেকে একটা কাপড়ে পেঁচিয়ে মসজিদেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। অতঃপর আবার নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। কুরআন কারীমের শুরু থেকে তিলাওয়াত আরম্ভ করতেন। সাহরীর সময় হলে সাথীদেরকে ডেকে তুলতেন। ততক্ষণে তিনি ‘সূরা মুলক’ পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন। তারপর সাথীদেরকে নিয়ে নামাযে খতম পূর্ণ করতেন এবং দুআ করতেন। পুরো রমযান মাস তিনি

এভাবেই আমল জারি রাখতেন। (দ্র. রিয়াযুন নুফূস, আবু বকর আলমালেকী, খ. ২, পৃ. ১৯৫)

মাহে রমযানে কুরআন কারীম তিলাওয়াতের এই জ্যোতির্ময় ধারাবাহিকতা এখানেই শেষ নয়; বরং

পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনীতেও সচরাচর এমনটাই চোখে পড়ে। এমনকি নিকট অতীতের আকাবিরে দেওবন্দ এবং হিন্দুস্তানের উলামায়ে কেরামও এর ভিন্ন ছিলেন না। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. রচিত 'আকাবির কা রমযান' কিতাবটিতে এজাতীয় বেশ কিছু ঘটনা স্থান পেয়েছে। তারা যে শুধু তিলাওয়াত করতেন, তা নয়; বরং মাহে রমযানের বরকতময় সময়কে উপলক্ষ করে কুরআন কেন্দ্রিক নানান ধরনের মেহনত চালু রাখতেন।

বেশি থেকে বেশি কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা, তারাবীহ ও কিয়ামুল লাইলে কুরআন খতম করা, কুরআনের এক একটি আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর ও চিন্তা-ফিকির করা, তাফসীরের আয়োজন করা, কুরআনের শিক্ষাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা, পরিবার-পরিজন, এলাকার লোকজন এবং জনসাধারণকে কুরআনের অমোঘ তালীমাতের প্রতি মনোনিবেশ করতে সচেষ্ট হওয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে তাঁরা মাহে রমযানের এই পবিত্র দিনগুলোকে যথাসম্ভব অর্থবহ করে তুলতে চেষ্টা করতেন। কুরআনের এই মাসকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করতে নিবিষ্ট মনে আত্মনিয়োগ করতেন।

শেষ কথাঃ

আমাদেরও উচিত কুরআনের পেছনে বেশি থেকে বেশি সময় ব্যয় করা। মাহে রমযানের এই সৌভাগ্যময় দিনগুলোকে নিজেদের যিন্দেগীর জন্য গনীমত মনে করে জান্নাতের পাথেয় সংগ্রহ করা। এর জন্য প্রয়োজন কেবল নেক নিয়ত, বুকভরা হিম্মত আর যথাযথ ঈমানী প্রেরণা। আল্লাহ তাআলাই তাওফীকদাতা।

রমাদান : যে মাসে নবীজী দু'হাত ভরে দান করতেন

রমযান মাস অন্য এগারোটি মাসের চেয়ে ভিন্ন। এ মাসে আমাদেরকে দিনের বেলা অন্যান্য মাসের চেয়ে বেশি সংযমী হয়ে চলতে হয়। এ মাসে কুপ্রবৃত্তিকে আরো দলিত করতে হয়। পাপকে আরো কঠোরভাবে পরিহার করতে হয়। অতীতের সব গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে হয়। পুণ্যের পথে আরো অগ্রসর হতে হয়। পুরো রমযানকে সাজানো হয় পুণ্যের সহায়করূপে। শয়তানকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। রহমত ছেয়ে রাখে মুসলিম উম্মাহকে। এ মাস আগমনের পনেরো দিন আগে আল্লাহ তাআলা বারাআতের মতো রজনী দান করেছেন। যে রাতে হিংসুক ছাড়া সমস্ত মুমিনের ব্যাপারেই ক্ষমার ঘোষণা আছে।

ইসলাম কল্যাণের পথে যেমন ধাবিত হতে বলে, তেমনি কল্যাণের পথে চলার মতো সব আয়োজনও করে দেয়। একে অপরকেও কল্যাণের পথে সহযোগী হতে বলে। কুরআন-হাদীসে এধরনের বার্তা বহু আছে। কখনো বলেছে, সৎকাজ ও তাকওয়ার পথে পরস্পরকে সহায়তা করো। কখনো বলেছে, একে অপরকে সত্যের ওসিয়ত করো, সবরের ওসিয়ত করো।

হাদীস আমাদের বার্তা দেয়, এক মানুষ আরেক মানুষকে সহায়তা করলে আল্লাহ্ও তার সহায়তা করেন। এমনকি জালেমকেও সহায়তা করতে বলেছে ইসলাম। জালেমের সহায়তা হয় কী করে?

জালেমের সহায়তা হয়, তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে।

মনুষ মানুষকে নানাভাবেই সহায়তা করতে পারে। রমযানে মানুষকে কল্যাণ ও তাকওয়ার পথে সহায়তার একটি অংশ হল, আর্থিক অনুদান। এ অনুদান মানুষকে শ্রমসাধ্য ও ভারি কাজ কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। ফলে মানুষ সহজে রোযা রাখতে পারে। রাতের তারাবী অনায়াসে আদায় করতে পারে। আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত মানুষটি নিবিষ্ট মনে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে পারে।

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দানের বেলায় উপমাহীন। তিনি মানুষকে দান করতেন দারিদ্র্যের ভয় না করে। একবার একজনকে দান করেছিলেন মাঠভর্তি ছাগল। এত বড় অনুদান পেয়ে লোকটি নিজ গোত্রের কাছে ফিরে বলেছিলেন, তোমরা মুহাম্মাদের দ্বীনের ওপর ঈমান আনো। তিনি এমনভাবে দান করেন, যেন দারিদ্র্যকে ভয় পান না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১২

তিনি দানকে মনে করতেন স্থায়ী সম্পদ। একদিন ঘরে বকরী জবাই হল। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, কতটুকু বাকি আছে?

ঘর থেকে বলা হল, কাঁধের অংশটাই শুধু আছে। বাকিটা দান করা হয়ে গেছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না বরং কাঁধের অংশ ছাড়া বাকিটা রয়ে গেছে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৭০

এমনই ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানের হাত। রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানের সীমা-পরিসীমা থাকত না। ইবনে আব্বাস রা. সে দানের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। তিনি রমযান মাসে সবচেয়ে বেশি দান করতেন যখন জিবরীল আ.-এর সাথে দেখা হত। জিবরীল আ.-এর সাথে দেখা হলে তিনি হয়ে উঠতেন মুক্ত বাতাসের চেয়েও দানশীল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮০৩

ইমাম আহমাদ রাহ. মুসনাদে আহমাদে (২০৪২) বর্ণনা করেন-

لا يُسأل عن شيءٍ إلا أعطاه.

কেউ চাইলে তিনি না করতেন না।

ইবনে উমর রা. বলেছেন-

مَا رَأَيْتُ أَجْوَدَ، وَلَا أَمْجَدَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো বড় দানশীল ও সম্ভ্রান্ত কাউকে দেখিনি। -আলইস্তিযকার, ইবনে আবদুল বার, বর্ণনা ১৯৯১২

এমন ছিল আমাদের নবীজীর দানশীলতা। এভাবেই তিনি দান করতেন রমযান মাসে। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন কারীমে আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। বলেছেন, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করে তারা নবীজীকে আদর্শ মানে, তাঁকে অনুসরণ করে।

আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশা নিয়েই তো আমরা দুনিয়াকে জেলখানা হিসেবে বরণ করে নিয়েছি। শুধু ঈমানের কারণে দেশে, দেশের বাইরে, সংখ্যালঘু হয়ে, অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও কাফেরদের এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্বধর্মীয় অবোধ ভাইদের নিপীড়ন সহ্য করে যাচ্ছি। ৯২% মুসলিম অধ্যুষিত দেশে 'জয় শ্রী রাম' শ্লোগানের ভয়ে বিচারক নিরপরাধ মুসলিমকে জামিন দেয় না। সমকামিতার বিরুদ্ধে কথা বললে, হাদীসের উদ্ধৃতি টানলে শিক্ষকের চাকরি চলে যায়। হিজাবের কারণে ছাত্রী পরীক্ষার অযোগ্য বিবেচিত হয়। কখনো হিজাবের কারণে নম্বর কেটে দেওয়া হয়। যুগ যুগ ধরে নির্যাতন সয়ে যাচ্ছি আরাকানে, কাশ্মীরে, চীনের উইঘুরে, ফিলিস্তিনে। গত চার মাস ধরে কী জুলুমই না বয়ে যাচ্ছে গাজার ওপর দিয়ে।

এসব কিছুই সহ্য করছি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশায়। তাই সে প্রত্যাশাকে পূর্ণতা দিতে যে আমলগুলো আছে, সে আমলের একটি অংশ হল, দান-সদকা। আর রোযার মাসের দান-সদকা সেই প্রত্যাশা পূরণে আরও সহায়ক আরো কার্যকর।

ইবনে রজব হাম্বালী রাহ. রমযান মাসে দানের অনেক ফায়েদা লিখেছেন। তার মধ্যে একটি হল, 'রোযা রাখতে গিয়ে আমাদের কোনো না কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েই যায়। রোযার মাধ্যমে গোনাহ মাফ হতে হলে রোযাও সেসব ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে, যা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। দান-সদকা সেসব

ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করে। এজন্যই রোযার শেষে ফিতরা ওয়াজিব করা হয়েছে- রোযাদারকে অহেতুক ও অশ্লীল কাজের গোনাহ থেকে মুক্ত করার জন্য।' -লাতাইফুল মাআরিফ, পৃ. ২৩২

অনেক দিনমজুরই কষ্টসাধ্য কাজের কারণে রোযা রাখতে পারে না। আমাদের একটু উদারহস্তের দ্বারা এ মানুষগুলো বরকতময় মাসের বরকত লাভ করতে পারে। খোদার নাফরমানী থেকে বেঁচে যেতে পারে। আমাদের চোখের সামনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করে রিকশাওয়ালারা। তাদেরকে এক বেলার ইনকাম পরিমাণ দান করলে ওই দিনের রোযাটা রাখতে পারে।

অনেক মানুষই অর্থের অভাবে সাহরী-ইফতারে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না। আমার মনোযোগ ওদের সাহরী-ইফতার সহজ ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে পারে। এভাবে আমরা খেয়াল করলে রমযানের বরকত সবশ্রেণি পেশার মানুষকে ছুঁয়ে যাবে। সহমর্মিতার মাসে সত্যিকার অর্থে সহমর্মী সমাজ গড়ে উঠবে।

রমযানের মতো মহিমাময় মাসে, রমযানের স্নিগ্ধ দিনগুলোতে, প্রশান্ত রাতগুলোতে আমরা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আরো কাছাকাছি যেতে পারি। দান-সদকা ও মানবসেবার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের রমযানগুলোকে যেন আরো সুন্দর করে তুলতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন।

ইসলামে রোজার বিধান

ইসলামে রোজা (সিয়াম) হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা মুসলিমদের ওপর ফরজ। রোজা বা সিয়াম মুসলমানদের জন্য শুধু একটি শারীরিক অভ্যাস নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা কুরআনে রোজার গুরুত্ব এবং বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদিসে রোজার মূল উদ্দেশ্য এবং নিয়মাবলী পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন।
এখানে ইসলামে রোজার বিধান, তা পালন করার শর্ত, এর উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন হাদিসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১. রোজার ফরজ বিধান

রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ (বাধ্যতামূলক)। রোজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। কুরআন শরীফের একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোজাকে মুসলিমদের ওপর ফরজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে যারা বিশ্বাস রাখো! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন পূর্ববর্তী জাতির উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, রোজা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়, বরং পূর্ববর্তী জাতির জন্যও ফরজ ছিল, তবে রমজান মাসের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে মুসলিমদের জন্য।

২. রোজার শর্তাবলী

রোজা পালনের জন্য কিছু শর্ত এবং বিধান রয়েছে। এসব শর্ত পালন করলেই রোজা আদায় হবে এবং এর সাওয়াব পাওয়া যাবে। এই শর্তগুলো নিম্নরূপ:

1. **ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়া:**

   রোজা শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য ফরজ। মুমিন ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষ রোজা রাখলে তার কোন ইবাদত হিসেবে গ্রহণ হবে না। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন:

   وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

   "তাদেরকে শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলা হয়েছে, একমাত্র তাঁর জন্য দ্বীনকে বিশুদ্ধ রেখে।"

   — (সূরা আল-বায়িনা: ৫)

2. **বুঝতে সক্ষম হওয়া:**

রোজা রাখার জন্য একজন মুসলিম প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে এবং তার বোধশক্তি সম্পূর্ণ হতে হবে। শিশুদের জন্য রোজা ফরজ নয়, তবে যখন তারা বালেগ হবে, তখন তাদের জন্য রোজা ফরজ হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ :عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"তিন শ্রেণির মানুষ থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে: শিশুদের, যতক্ষণ না তারা বালেগ হয়, ঘুমন্তদের, যতক্ষণ না তারা জাগে এবং পাগলদের, যতক্ষণ না তারা সুস্থ হয়ে ওঠে।"

— (সহিহ মুসলিম)

3. **স্বাস্থ্যবান থাকা:**

রোজা রাখার জন্য একজন মুসলিমের সুস্থ হতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তি, যাদের অসুস্থতা স্থায়ী বা গুরুতর, তাদের জন্য রোজা রাখা শিথিল। তারা যদি রোজা রাখতে সক্ষম না হন, তবে তারা তার পরিবর্তে গরিবদের জন্য কফফারা দিতে পারেন (একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য দান করা)। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তবে অন্যদিনগুলিতে রোজা রাখতে হবে।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)

4. **যাত্রায় না থাকা:**

সফরে থাকলে রোজা রাখা শিথিল। সফরকারী ব্যক্তিকে রোজা না রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, সফর শেষে তার রোজা পূর্ণ করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ رَسُولَهُ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَمَحَ لِمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَنْ يُفْطِرُوا

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল রমজান মাসের রোজা ফরজ করেছেন এবং অসুস্থ বা সফরে থাকা ব্যক্তিদের জন্য ইফতার করার অনুমতি দিয়েছেন।"

— (সহিহ বুখারি: ১৯৫০)

৩. রোজার কার্যাবলী

রমজান মাসের রোজা রাখার জন্য যেসব কাজ করা উচিত এবং যে কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হয়, তা নিম্নরূপ:

1. **সেহরি ও ইফতার:**

   রোজা শুরু হয় সেহরি দিয়ে, অর্থাৎ, রাতের শেষভাগে খাবার খাওয়া হয় এবং সূর্যোদয়ের পর থেকে রোজা শুরু হয়। রোজা শেষ হয় সূর্যাস্তের পর, অর্থাৎ ইফতার দিয়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

   تسحَّرُوا فإنَّ في السَّحورِ بركةً

   "সেহরি খান, কারণ সেহরিতে বরকত আছে।"

   — (সহিহ বুখারি: ১৯০৩)

2. **খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকা:**

   রোজাদার ব্যক্তিকে সেহরি থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকতে হবে। এটি রোজার মূল কাজ এবং এর মাধ্যমেই রোজা পূর্ণ হয়।

3. **যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা:**

   রোজার সময় দিনের বেলা যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। তবে, সূর্যাস্তের পর ইফতার করার পর, রাতের বেলা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

   فَانكِحُوهُنَّ إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الطَّوْفِ

   "তবে, যখন তারা শুদ্ধ হয়, তখন তাদের কাছে যাও।"

   — (সূরা আল-বাকারা: ২২২)

4. **মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা:**

   রোজার মূল উদ্দেশ্য শুধু খাদ্য বা পানীয় থেকে বিরত থাকা নয়, বরং এটি একজন মুমিনকে মন্দ কাজ, গীবত, মিথ্যা বলা, রাগান্বিত হওয়া, বা কোনো ধরনের খারাপ আচরণ থেকে বিরত রাখতে শেখায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

   مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

   "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও মন্দ কাজ করা ছেড়ে দেয় না, তার জন্য আল্লাহর কাছে রোজা রাখার কোন উপকারিতা নেই।"

— (সহিহ বুখারি: 1903)

৪. রোজার উপকারিতা

রোজার ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক উপকারিতা অনেক। এর মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন এবং আখিরাতে বিশেষ পুরস্কারের জন্য যোগ্য হন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْ

অন্যান্য ধর্মে রোজার ধারণা

রোজার ধারণা শুধু ইসলামেই নয়, অন্যান্য ধর্মেও বিদ্যমান। ধর্ম অনুযায়ী এর আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন হলেও আত্মশুদ্ধি এবং ত্যাগের মূলনীতি একই।

১. খ্রিস্টধর্মে রোজা:

খ্রিস্টধর্মে উপবাস বা রোজার ধারণা বিদ্যমান। বিশেষ করে, ইস্টারের আগে **লেন্ট (Lent)** নামে ৪০ দিনের উপবাস পালন করা হয়। এতে খাদ্য গ্রহণ সীমিত রাখা হয় এবং প্রার্থনায় বেশি সময় ব্যয় করা হয়।

২. ইহুদি ধর্মে রোজা:

ইহুদি ধর্মে **ইয়োম কিপুর (Yom Kippur)** নামে উপবাসের দিন রয়েছে, যা পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে পালিত হয়। এই দিনে ইহুদিরা পানি এবং খাদ্য থেকে বিরত থাকে।

৩. হিন্দু ধর্মে উপবাস:

হিন্দু ধর্মে উপবাস একটি প্রচলিত চর্চা। যেমন, **একাদশী ব্রত** পালন করা হয়, যা শারীরিক ও আত্মিক শুদ্ধির লক্ষ্যে পালিত হয়।

৪. বৌদ্ধধর্মে উপবাস:

বৌদ্ধধর্মে পূর্ণিমার দিনে উপবাস করা হয়, যা শারীরিক শুদ্ধি এবং ধ্যানের জন্য করা হয়।

তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলামের রোজা এবং অন্যান্য ধর্মের উপবাসের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো—ইসলামের রোজা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পুরোপুরি খাদ্য, পানীয়, এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত। এটি শুধু শারীরিক ত্যাগ নয়; বরং নৈতিক, আত্মিক, এবং সামাজিক দিক থেকেও অত্যন্ত গভীর।

কুরআনের আয়াত:

"হে মানবজাতি! আমরা তোমাদের জাতি, ধর্ম এবং গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।"

— (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)

রোজা শুধু ইসলামিক ইবাদত নয়; এটি সামাজিক, নৈতিক, এবং বৈশ্বিকভাবে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এটি সমাজে সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে, অপরাধ হ্রাস করে এবং বৈশ্বিক সংহতির বার্তা দেয়। অন্য ধর্মেও রোজার মতো উপবাসের ধারণা বিদ্যমান, যা মানবজীবনের বিভিন্ন দিককে পরিশুদ্ধ করে। ইসলামে রোজার গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য কুরআন ও হাদিসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা অন্য ধর্মের উপবাস থেকে আলাদা এবং অনন্য।

রমজানের রোজা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। এটি শুধু আল্লাহর আদেশ পালনের একটি ইবাদত নয়; বরং এটি মানুষের আত্মিক, শারীরিক, এবং সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। রোজার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে এবং নিজের জীবনের লক্ষ্যগুলোকে শুদ্ধ করে। এ অধ্যায়ে রোজার আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও সামাজিক ফজিলত এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

বিভিন্ন ধর্মে রোজার অবস্থান ও ভূমিকা

রোজা বা সিয়াম (fasting) একটি আধ্যাত্মিক অভ্যাস যা মানুষের আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম এবং ধৈর্যের পরীক্ষা হিসেবে বিভিন্ন ধর্মে পালিত হয়। ইসলাম, খ্রিস্টানিটি, ইহুদী ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মে রোজার অবস্থান এবং ভূমিকা রয়েছে, যদিও প্রতিটি ধর্মের রোজার উপকরণ, সময় এবং উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এই লেখায় আমরা বিভিন্ন ধর্মে রোজার ভূমিকা এবং অবস্থান হাদিসসহ আলোচনা করব।

১. ইসলাম ধর্মে রোজা

ইসলামে রোজা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা মুসলিমদের ওপর রমজান মাসে ফরজ করা হয়েছে। রোজার উদ্দেশ্য হল আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, এবং তাকওয়া বা ভয়ে পূর্ণ জীবন যাপন। রোজার বিধান কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনের নির্দেশ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ ছিল পূর্ববর্তী জাতির উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এটি প্রমাণ করে যে, রোজা শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, পূর্ববর্তী জাতির উপরও ফরজ ছিল।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ

"যখন রমজান আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, দোজখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।"

— (সহিহ বুখারি)

এখানে রোজা একটি বিশেষ সময়ের ইবাদত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহর রহমত প্রবাহিত হয় এবং শয়তান থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

২. খ্রিস্টান ধর্মে রোজা

খ্রিস্টান ধর্মেও রোজা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যদিও এটি ইসলামিক রোজার মতো কঠোর নয়। খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা লেন্ট নামক একটি সময়কাল অনুসরণ করেন, যা চলতে থাকে ৪০ দিন। এই সময়ে তারা আত্মশুদ্ধি এবং তাপস সাধনা করে।

লেন্ট:

খ্রিস্টান ধর্মে, **লেন্ট** একটি ৪০ দিনের পর্ব, যা বিশেষত খ্রিস্টানদের মধ্যে পালন করা হয়, যেখানে তারা খাদ্য গ্রহণে নিয়ন্ত্রণ রাখেন এবং প্রার্থনা, তাপস সাধনা ও আত্মশুদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেন। এই ৪০ দিন ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও ত্যাগের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

বাইবেল:

বাইবেলে সিয়াম বা রোজার বিষয়ে কিছু উল্লেখ রয়েছে। মথি ৬:১৬-১৮-এ বলা হয়েছে: **"আর যখন তোমরা রোজা রাখো, তখন তোমরা মলিন মুখ করবে না এবং তোমরা শোকের মতো মুখ বাঁকাবে না, যেন মানুষ তোমাদের রোজা রাখার খবর পায়। কিন্তু তোমার পিতা, যে গোপনে থাকে, সে তোমাদের গোপন রোজার পুরস্কার দেবে।"**

এখানে রোজার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে এবং গোপনে ইবাদত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৩. ইহুদী ধর্মে রোজা

ইহুদী ধর্মে রোজার সময়কাল এবং উদ্দেশ্য ভিন্ন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোজা হল **ইয়োম কিপ্পুর** (Yom Kippur), যা পাপের ক্ষমা চাওয়ার একটি দিন। ইয়োম কিপ্পুরের সময়ে ইহুদীরা ২৫ ঘণ্টা রোজা রাখেন এবং প্রার্থনা ও তপস্যা করেন।

ইয়োম কিপ্পুর:

ইহুদী ধর্মের অনুসারীরা এই দিনে পূর্ণ রোজা রাখেন, যা পানীয় বা খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে পালন করা হয়। এটি এক ধরনের আত্মশুদ্ধির পর্ব, যেখানে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

তাওরাত:

তাওরাতে রোজা বা সিয়াম সম্পর্কিত কিছু নির্দেশনা রয়েছে, যেমন: **"এখন থেকে তোমরা সিয়াম পালন করবে এবং পাপ থেকে মুক্তি পাব।"**

(যদিও এই নির্দেশনা তাওরাতে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়, তবে এর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং শুদ্ধ হওয়া।)

৪. হিন্দু ধর্মে রোজা

হিন্দু ধর্মে, সিয়াম বা রোজা একেবারেই আলাদা ধরনের পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়। যদিও সিয়াম হিন্দু ধর্মের একটি বাধ্যতামূলক ইবাদত নয়, তবে তপস্যা, সাধনা এবং উপবাসের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির প্রথা রয়েছে।

উপবাস:

হিন্দু ধর্মে **উপবাস** একটি সাধারণ ধারণা, যেখানে ভক্তরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে খাবার থেকে বিরত থাকেন এবং উপবাস করেন। উপবাসের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য এবং আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন।

গীতা:

হিন্দু ধর্মের **ভগবদ গীতা**-তে বলা হয়েছে: **"যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঈশ্বরের উপাসনায় মনোযোগী হয়, সে উপবাসের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে।"**

এটি আত্মশুদ্ধি ও শান্তির পথ হিসেবে উপবাসের ভূমিকা বর্ণনা করে।

৫. অন্যান্য ধর্মে রোজার প্রথা

বিশ্বের অন্যান্য ধর্মেও রোজা বা সিয়ামের ধারণা রয়েছে। বিভিন্ন আদর্শ এবং ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে, একেক ধর্মে রোজার বিধান ভিন্ন হতে পারে, তবে তাদের মূল উদ্দেশ্য হল আত্মশুদ্ধি, ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য, এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ।

সর্বোপরি, রোজা বা সিয়াম প্রতিটি ধর্মেই আত্মশুদ্ধি, ঈশ্বরের সন্তুষ্টি এবং ত্যাগের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়ার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে পালন করা হয়। ইসলামে রোজা একটি ফরজ ইবাদত, যা রমজান মাসে পালন করতে হয়, এবং এটি মুসলিমদের জন্য আত্মিক পরিশুদ্ধির একটি বড় মাধ্যম। অন্য ধর্মগুলিতেও, যেমন খ্রিস্টান ধর্ম, ইহুদী ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মে, রোজা বা উপবাসের মাধ্যমে মানুষের আত্মশুদ্ধি, ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণের দিকটি গুরুত্ব পায়।

কুরআন মজীদ ও সহীহ হাদীসের আলোকে রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

রমযনের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রোযার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(তরজমা) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

(তরজমা) সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،

وفي رواية :صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।

তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

.بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيابي جبلا وعرا فقالا :اصعد؛ فقلت :إني لا أطيقه فقالا :سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت :ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة .اشداقهم، تسيل اشداقهم دما .قال :قلت :من هؤلاء :قال :الذين يفطرون قبل تحلة صومهم رواه الحاكم فى المستدرك وقال :صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمى فى المجمع)240(، وقال :رجاله رجال الصحيح

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

،من افطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال :وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد ... عوامه :وهذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০

হযরত আলী রা. বলেন-

.من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى :الا الصوم فإنه لى وانا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال الله :يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وانا اجزى به، والحسنة بعشر امثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০

রোযা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-আললাহ তাআলা বলেন, “প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)

এ কথার তাৎপর্য হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার

অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

রোযার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্য্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে।-সূরা যুমার (৩৯) : ১০

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওযায়ী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

،ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من اعطش نفسه له في صائف سقاه يوم العطش

رواه البزار، وذكره الهيثمي في المجمع)5095(، وقال :رواه البزار، ورجاله موثقون .وقال المنذري في الترغيب)1478(، :إسناده حسن، ان شاء الله.

আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জণ্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

،قال الله تعالى :الصيام لى وانا اجزى به ...فان لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصائم

رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع،)5093(، وقال :رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য

কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ

عن حذيفة رضي الله عنه قال :اسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال :من قال ،لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة : ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه احمد، وذكره الهيثمى فى المجمع)11935(وقال :رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتى وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ احمد شاكر والشيخ شعيب الارنؤوط.

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪

،عن أبي أمامة قال :أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت :مرني بعمل يدخلني الجنة قال :عليك بالصوم، فانه لا عدل له، ثم أتيته الثانية، فقال لي :عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০

৪. রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن فى الجنة بابا يقال له الريَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق، فلم يدخل منه احد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা

বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮

হযরত সাহল ইবেন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ان للصائمين بابا فى الجنة يقال له :الريان، لا يدخل منه غيرهم اذا دخل آخرهم اغلق، ومن دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ ابدًا.

قال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح غريب.

জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস : ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৪৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لكل اهل عمل باب من ابواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولاهل الصيام باب يدعون منه، يقال له :الريان، فقال أبو بكر :يا رسول الله، هل احد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال :نعم، وارجو أن تكون منهم يا ابا بكر،

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে 'রাইয়ান'। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮

এ সম্পর্কে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة :يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر :بأبي أنت وأمي، يا رسول الله !ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال :نعم، وأرجو أن تكون منهم.

(সহীহ বুখারী, হাদীস-১৮৯৬, ৩৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০২৭ (৮৫-৮৬); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-৭৬৩৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস -৩০৯)

৫. রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال ربنا عز وجل :الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لى وانا أجزى به.
وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قاله الشيخ شعيب الارنؤوط

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال،

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১

৬. রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام :اى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن :منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال :فيشفعان له.

رواه أحمد، والحاكم فى المستدرك وقال :صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي فى المجمع، وقال :رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪

৭. রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ'র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮

৮. রোযা গুনাহের কাফফারা

রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হা. ২২৫৮

৯. রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

،والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮

১০. রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقى ربه فرح بصومه، وفى رواية :اذا لقى الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪, ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩, ১৬৪, ১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৬

১১. রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله !أرايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২২১২, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৪২৯

১২. রোযাদারের দুআ কবুল হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.

قال البوصيرى :اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫৩

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام،
وتفتح لها ابواب السماوات، ويقول الرب عز وجل :وعزتى لانصرنك ولو بعد حين.
وقال الترمذى :هذا حديث حسن.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (অর্থাৎ তাদের দুআ কবুল করা হয়) ন্যায়পরায়ন শাসকের দুআ; রোযাদার ব্যক্তির দুআ ইফতারের সময় পর্যন্ত ও মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার ইয্যতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৮

হযরত আবু হুরায়রা রা. র্বণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصائم لا ترد دعوته،
وهذا الحديث اسناده حسن قاله الشيخ محمد عوامة

রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৯৫

১৩. রোযা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়

صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر،
وقال المنذرى :ورجاله رجال الصحيح، ورواه احمد وابن حبان والبيهقى الثلاثة من حديث الأعرابى ولم يسموه،)اى ابن عباس(

হযরত ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমযান মাস) রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোযা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। -মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৬৫২৩

১৪. আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

عن أبى أمامة قال :قلت يا رسول الله !مرنى بعمل قال :عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت :
يا رسول الله !مرنى بعمل قال :عليك بالصوم، فانه لا عدل له.

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন, তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই।-সহীহ ইবনে খুযাইমা,

হাদীস : ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৫; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ২৫৩৩

عن أبى أمامة الباهلى قال :قلت يا رسول الله مرنى بأمر ينفعنى الله به، قال :عليك بالصوم فانه لا مثل له.

هذا حديث اسناده صحيح على شرط مسلم قاله الشيخ شعيب وكذا قاله الشيخ أحمد شاكر.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের আদেশ করুন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা তার তুলনা হয় না।-সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩৮৯৩ তাবারানী, হাদীস: ৭৪৬৩ রমযান হল খালেস ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততটা ভালো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হাদীস অনুযায়ী আমল করার ও উক্ত ফযীলত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাববাল আলামীন।

রোজার ফজিলত (অপরিসীম পুরস্কার)

রোজা বা সিয়াম ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং এটি আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। রোজার মাধ্যমে একজন মুসলিম শুধু শারীরিকভাবে অভুক্ত থাকে না, বরং তার আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে। ইসলামে রোজার অনেক ধরনের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, যা কুরআন ও হাদিসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে রোজার কিছু প্রধান ফজিলত, যা মুসলমানদের জন্য অপরিসীম পুরস্কার হিসেবে বিবেচিত, তা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

রোজার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

রোজা রাখা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম পথ। রোজার মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ": مَن صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।"

— (সহিহ বুখারি)

এই হাদিস থেকে জানা যায় যে, যারা ঈমান এবং সাওয়াবের আশায় রোজা রাখে, তাদের পূর্ববর্তী পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। এই রোজার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়।

পাপ মাফ হওয়া

রমজান মাসে রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার সমস্ত পাপ মাফ করতে সক্ষম হয়। এটি আল্লাহর মহান দয়া এবং রহমতের নিদর্শন। হাদিসে এসেছে:

مَن صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"

— (সহিহ বুখারি)

এটি রোজার সবচেয়ে বড় ফজিলত হিসেবে বিবেচিত। রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর কাছে তওবা করে তার সকল পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা রোজা রাখাকে এত মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে বান্দা পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে এবং তাঁর পূর্ববর্তী সব পাপ মাফ করে দেন।

জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া

রমজান মাসে রোজা রাখলে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ

"যখন রমজান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, দোজখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।"

— (সহিহ বুখারি)

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রমজান মাসের সময় আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দরজা খুলে দেন, যাতে তাঁর বান্দারা বেশি বেশি সৎকর্ম করতে পারে। একই সাথে, শয়তানদের শৃঙ্খলিত করে দেওয়া হয়, যাতে তারা সহজে মানুষকে পাপের দিকে পরিচালিত না করতে পারে। এটি একটি মহান পুরস্কার, যা আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে তাঁর বান্দাদের জন্য প্রদান করেন।

রোজার রুহানী উপকারিতা

রোজার একাধিক রুহানী উপকারিতা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, আত্মিক শান্তি এবং আত্মশুদ্ধি। রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিম নিজেকে বিভিন্ন প্রকার ধৈর্য, কন্ট্রোল এবং আত্ম-সংযম শেখায়। রোজার মাধ্যমে একদিকে আত্মিক শুদ্ধতা অর্জিত হয়, অন্যদিকে একজন ব্যক্তি তার অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

صِيَامُ جُنَّةٍ مِّنَ النَّارِ

"রোজা হলো আগুন থেকে রক্ষার একটি ঢাল।"

— (সহিহ মুসলিম)

এটি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, রোজা মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার মাধ্যমে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার দিকে পরিচালিত করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে রোজার মাধ্যমে দান করা হয় একজন মুসলিমকে শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করার ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান।

রোজার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি

রোজার মাধ্যমে একজন মুসলিম শুধুমাত্র শারীরিকভাবেই খাদ্য, পানীয় এবং যৌনাচার থেকে বিরত থাকে না, বরং সে নিজের অন্তরকে খারাপ চিন্তা, বাজে অভ্যাস এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট দিক থেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে। রোজার উদ্দেশ্য শুধু শরীরের ক্ষুধা নিবারণ নয়, বরং এটি আত্মার পরিশুদ্ধির জন্যও একটি উপায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে যারা বিশ্বাস করো! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন পূর্ববর্তী জাতির উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া (আল্লাহর ভীতি) অর্জন করতে পার।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, রোজা রাখার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর প্রতি ভীতি (তাকওয়া) সৃষ্টি করা, যা আত্মিক শুদ্ধতার একটি প্রধান উপায়। এক্ষেত্রে, রোজার মাধ্যমে একজন মুসলিম নিজের গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক অবস্থা পরিশুদ্ধ করতে পারে এবং তার আত্মার উন্নতি সাধন করতে পারে।

রোজার শারীরিক ও সামাজিক উপকারিতা

রোজার শারীরিক ও সামাজিক উপকারিতা ইসলামিক পন্থায় জীবনযাপন ও মানবিক মূল্যবোধে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় উপকারিতাই নয়, রোজা স্বাস্থ্য ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। এখানে রোজার শারীরিক ও সামাজিক দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা কুরআন ও হাদিসের আলোকে বর্ণিত।

শারীরিক স্বাস্থ্য উপকারিতা

রোজা শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। দীর্ঘক্ষণ অভুক্ত থাকার মাধ্যমে শরীরের মেটাবলিজম সিস্টেমে পরিবর্তন আসে এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দূর হয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেও রোজার শারীরিক উপকারিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা রোজা ফরজ করেছেন, যা শরীরের জন্য একটি ভালো পরিস্কারকারী প্রক্রিয়া।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

صِيَامُ جُنَّةٍ مِّنَ النَّارِ

"রোজা হলো আগুন থেকে রক্ষার একটি ঢাল।"

— (সহিহ মুসলিম)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রোজা শরীরকে শুধু শয়তান থেকে রক্ষা করে না, বরং এটি শরীরের অপ্রয়োজনীয় উপাদান ও বিষাক্ত পদার্থগুলি বের করে দিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখে। রোজার মাধ্যমে অন্ত্র ও পাচনতন্ত্রের বিশ্রামও হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। রোজা রাখার ফলে খাওয়ার পরিমাণ কম হয়, ফলে ওজন কমাতে সাহায্য হতে পারে এবং ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমে।

মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা

রোজা একজন মুসলিমকে মানসিক শান্তি এবং স্থিতিশীলতা প্রদান করে। অভুক্ত থাকার সময় মানুষ মনের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করে এবং কোনো নেতিবাচক চিন্তা বা অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। রোজার মাধ্যমে একটি ধীরে ধীরে আত্মশুদ্ধি ঘটে, যা মনোযোগ এবং চিন্তার গতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"হে বিশ্বাসীগণ, যখন শুক্রবারের নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আল্লাহর স্মরণে ছুটে যাও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করো।"

— (সূরা আল-জুমুআ: ৯)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ধৈর্য এবং স্থিতিশীলতার সাথে আল্লাহর ইবাদত পালন করা মনের শান্তি এবং সুখের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোজা মানুষকে মনোবল এবং ধৈর্য প্রদান করে, যা মানসিক চাপ কমায় এবং মনের শান্তি বাড়ায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ لِصَائِمِ فَرْحَتَيْنِ :فَرْحَةً عِندَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةً عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ

"রোজাদারের দুটি আনন্দ রয়েছে: একটি যখন সে ইফতার করে, এবং অন্যটি যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে।"

— (সহিহ বুখারি)

এই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোজাদার যখন তার আত্মবিশ্বাস এবং শান্তি অনুভব করে, তখন তার রোজা শুদ্ধ হয় এবং সে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে।

সামাজিক দিক: সহানুভূতি, দানে উৎসাহ

রোজা সামাজিক সম্পর্কের উন্নতিতে বড় ভূমিকা রাখে। অভুক্ত থাকার কারণে, একজন রোজাদার প্রিয়জন, গরিব-দুঃখী ও অভাবীদের অবস্থা অনুভব করতে পারে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। রোজা রক্ষা করার সময় একে অপরের জন্য সহানুভূতিশীল হওয়ার গুরুত্ব বাড়ে এবং দানে উৎসাহিত হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

"আর যদি আমার বান্দারা তোমার কাছে আমাকে সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তবে আমি তাদের কাছে নিকটে আছি। আমি তাদের ডাকে সাড়া দিই যখন তারা আমাকে ডাকে।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৬)

রোজা রাখার মাধ্যমে, একজন মুসলিম দানের প্রতি প্রেরিত হয় এবং গরিবদের সাহায্য করতে আগ্রহী হয়, যা সমাজে একতা এবং সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ وَيَمْشِي فِي رَحْمَتِهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত থাকে এবং অন্যদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল থাকে, সে আসলে ঈমান লাভ করেছে।"

— (সহিহ মুসলিম)

এটি বোঝায় যে, রোজা কেবল আত্মিক উন্নতির জন্য নয়, বরং সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত একজন ব্যক্তি হিসেবে সহানুভূতি এবং দানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে।

একতা ও বন্ধন সৃষ্টি

রমজান মাসে রোজা রাখার ফলে মুসলিম সমাজে একতা এবং বন্ধন তৈরি হয়। এই মাসে ইফতার, সেহরি ও নামাযের মাধ্যমে সমাজের মানুষ একে অপরের কাছাকাছি আসে এবং তাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَفَطَّرَ اللَّهُ فِي جَنَّتِهِ

"যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করায়, আল্লাহ তাকে জান্নাতে পানি পান করাবেন।"

— (ইবনে মাজাহ)

এটি একটি সামাজিক বন্ধনের প্রকাশ, যেখানে একজন মুসলিম অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন শক্তিশালী করে। রোজার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একতা সৃষ্টি হয়, কারণ তারা একই উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হয়, অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং মানবিকতা বিকাশ।

রমাদান মাসের গুরুত্ব ও ফজিলত

রমজান মাস ইসলামিক ক্যালেন্ডারের নবম মাস এবং এটি অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত। এটি এমন একটি সময়, যখন মুসলমানরা বিশেষভাবে ইবাদত, তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, দান এবং আত্ম-বিনোদনের জন্য প্রার্থনা করে। রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ এবং এটি মুসলিম জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এই মাসের প্রতি আল্লাহর রহমত এবং বিশেষ দয়ার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। এখানে রমজান মাসের গুরুত্ব এবং এর বিশেষ ফজিলত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রমজান মাসের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

রমজান মাসে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য বিশেষ রহমত এবং বরকত পাঠান। এটি আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং তাকওয়ার অর্জনের সবচেয়ে বড় সুযোগ। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে যারা বিশ্বাস করো! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন পূর্ববর্তী জাতির উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, রোজা রাখার মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর নিকট আত্মিক শুদ্ধতা অর্জন করে এবং তাদের তাকওয়া বা আল্লাহর ভীতি বৃদ্ধি পায়। রমজান মাসের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব এই যে, এটি মুসলিমদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, আত্মশুদ্ধি, এবং ঈমানকে শক্তিশালী করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

رَمَضَانُ صَارِمٌ قَاتِلٌ لِسَائِرِ الذُّنُوبِ

"রমজান মাস একটি ধারালো তলোয়ারের মতো, যা সমস্ত পাপকে ধ্বংস করে দেয়।"

— (ইবনে হিব্বান)

এটি নিশ্চিত করে যে, রমজান মাস পাপ থেকে মুক্তির এবং আত্মিক পরিশুদ্ধির সুযোগ এনে দেয়। রোজা ও ইবাদতের মাধ্যমে একজন মুসলিম তার আত্মাকে পরিষ্কার করে এবং আল্লাহর কাছে আরও নিকটস্থ হয়।

রমজান মাসের বিশেষ দোয়াগুলির গুরুত্ব

রমজান মাসে বিশেষ কিছু দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলিমরা এই সময়ে আল্লাহর কাছে তাদের মনোভাব এবং প্রার্থনা পূর্ণ করে। বিশেষভাবে রমজান মাসে দোয়া এবং তাওবার মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ لِصَائِمٍ عِندَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ

"রোজাদারের জন্য ইফতারের সময় এমন একটি দোয়া থাকে, যা কখনো মেনে নেওয়া

হয়।”

— (সহিহ ইবনে হিব্বান)

এই হাদিসে প্রমাণিত যে, রোজাদার যখন ইফতার করে, তখন তার দোয়া আল্লাহ তাআলা মেনে নেন। তাই রমজান মাসে বিশেষ করে ইফতারের সময়ে এবং তার অন্যান্য ইবাদতের সময় দোয়া করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রমজান মাসের মধ্যে লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব

রমজান মাসের সবচেয়ে মহিমান্বিত রাত হলো **লাইলাতুল কদর** (শক্তির রাত), যা কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। এই রাতটি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

“লাইলাতুল কদর এক হাজার মাস থেকে উত্তম।”

— (সূরা আল-কদর: ৩)

লাইলাতুল কদর রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে একটি রাত, যা অনুসন্ধান করতে হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“রমজান মাসের শেষ দশ দিন লাইলাতুল কদর সন্ধান করো।”

— (সহিহ বুখারি)

এই রাতটি এমন একটি সময়, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য অসীম রহমত, ক্ষমা এবং দয়া প্রদান করেন। এই রাতে দোয়া করা, ইবাদত করা, এবং আল্লাহর কাছে তওবা করা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ এবং মুসলিমদের জন্য এক দুর্দান্ত সুযোগ।

রোজার সময় ইবাদত ও সৎকর্মের গুরুত্ব

রমজান মাসে রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিম শুধু খাওয়া, পানীয় এবং অন্যান্য দুনিয়াবি ইচ্ছা থেকে বিরত থাকে না, বরং তা তাকে আরও বেশি ইবাদত, সৎকর্ম এবং দানে উৎসাহিত করে। এই সময়, মুসলমানরা কুরআন তেলাওয়াত, নফল নামায, দান-সদকা, এবং অন্যান্য সৎকর্মে অধিক মনোনিবেশ করে। রমজান মাসে সৎকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় কুরআন এবং হাদিস থেকে:

إِنَّ صَلَاةَ رَمَضَانَ تَمْحُوْا مَا فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوْبِهِ

“রমজান মাসের নামায পূর্ববর্তী গোনাহগুলো মুছে দেয়।”

— (সহিহ মুসলিম)

এছাড়া, রমজান মাসে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা, সৎকর্ম করা এবং আল্লাহর কাছে তাওবা ও দোয়া করা অন্যান্য মাসের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। এই মাসে রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার আত্মা পরিশুদ্ধ করতে পারে, নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করতে পারে এবং সমাজে ভালবাসা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি করতে পারে।

নবীজি (সঃ) যেভাবে রমাদান কাটাতেন

নবীজির রামাদান-পূর্ব দিনগুলো

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দুনিয়ার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী, অনাগ্রহী। তাই, ইবাদাতের উপলক্ষ্যে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। বিভিন্ন সময়ে রহমত-বরকত ও কল্যাণ অবতরণের উপলক্ষ্যে ব্যাকুল হতেন। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন-

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

আপনি বলেন-আল্লাহর ফজল ও করুণায় এটি হয়েছে। এর মাধ্যমেই তারা যেন আনন্দিত হয়। তারা যা সঞ্চয় করে, সে তুলনায় তা উত্তম।

আয়াতটি প্রমাণ করে মানুষের পার্থিব অর্জিত ধন-সম্পদ বা সঞ্চিত ব্যবহার্য নয়; আনন্দের উপকরণ হলো আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কুরআন, ইসলামের ফরজ বিধি- বিধান, ও আনুষঙ্গিক সম্পূরক সমূহ-যার অন্যতম সিয়াম।

রামাদানের সদ্ব্যবহারের উত্তম প্রমাণ হলো এ ব্যাপারে নবীজির সর্বাত্মক প্রস্তুতি, মানসিক ও আত্মিকভাবে রামাদানকে স্বাগত জানানোর জন্য ব্যাকুলতা; যেন তা পূর্ণাঙ্গভাবে কল্যাণব্রতী হয়, উদ্যমী হয় আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা উত্তরণের, সময়গুলো কাজে লাগে পূর্ণাঙ্গভাবে। এভাবে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি উভয় জগতের নেতা, রামাদান-পূর্ব সময় যাপন করতেন, সমাধা করতেন প্রস্তুতির নানা পর্ব। নিম্নে তার প্রস্তুতির উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো।

শাবান মাসে অধিক সিয়াম

রামাদানে দীর্ঘদিন সিয়াম রাখার দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য তিনি শাবান মাসে অধিক-হারে সিয়াম পালন করতেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول :لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم استكمل صيام شهر لا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো এমনভাবে সিয়াম পালন করতেন যে আমাদের মনে হতো, তিনি সিয়াম ত্যাগ করবেন না। আর কখনো এত দীর্ঘ সময় সিয়াম ত্যাগ করতেন যে, আমাদের মনে হতো তিনি আর সিয়াম পালন করবেন না। রামাদান মাস ব্যতীত পূর্ণ কোনো মাস তাকে আমি সিয়াম পালন করতে দেখি নি। এবং শাবানের তুলনায় ভিন্ন কোন মাসে এত সিয়াম পালন করতেও দেখি নি।

অন্য হাদিসে এসেছে-

ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلاً.

শাবানের তুলনায় অন্য কোন মাসে আমি তাকে এত অধিক-হারে সিয়াম পালন করতে দেখি নি। তিনি শাবানের প্রায় পুরোটাই রোজায় অতিবাহিত করতেন। কিছু অংশ ব্যতীত তিনি পুরো শাবান মাস সিয়াম রাখতেন।

সুতরাং, উক্ত হাদিসের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্ররই কর্তব্য, শাবান মাসে অধিক-হারে সিয়াম পালন করা। বিদগ্ধ উলামাদের মতামত এই যে- শাবানের সিয়াম হচ্ছে ফরজ সালাতের আগে ও পরে পালিত সুন্নতে মোয়াজাদার অনুরূপ এবং তা রামাদানের ভূমিকাতুল্য। অর্থাৎ, তা যেন রামাদানের পূর্বে পালিত প্রস্তুতিমূলক ইবাদাত। এ কারণেই শাবান মাসে সিয়াম পালন সুন্নত করা হয়েছে। এবং সুন্নত করা হয়েছে শাওয়াল মাসের ছয় রোজা। ফরজ নামাজের পূর্বের ও পরের সুন্নতের অনুরূপ।

রামাদানের সুসংবাদ প্রদান

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিগণকে রামাদানের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত-উদ্দীপিত করতেন, পরামর্শ প্রদান করতেন সর্বসু নিয়োগ করে তাতে কল্যাণ আহরণের জন্য আত্মনিয়োগের। এ বিষয়ে নানা হাদিস রয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء و غلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين.

যখন রামাদান মাস আগত হয়, আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয় জাহান্নামের কপাটগুলো, এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয় শৃঙ্খলে।

অপর হাদিসে এসেছে-

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وعلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يعلق منها باب، وينادي مناد يا باعي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة

রামাদানের প্রথম রাত্রিতে শয়তান ও দুষ্ট জিনদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের কপাটগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়-তার একটি দরজাও খোলা হয় না। উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজাগুলো, বন্ধ করা হয় না তার একটিও। একজন আহ্বানকারী আহ্বান জানিয়ে বলেন, হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও। আর যে অকল্যাণের প্রত্যাশী, বিরত হও। আল্লাহ জাহান্নাম হতে অনেককে মুক্তি দেবেন, এবং তা প্রতি রাতেই।'

ভিন্ন এক হাদিসে এসেছে-

أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغل فيه مردة الشياطين، الله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم

রামাদান-বরকতময় মাস-তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। পুরো মাস সিয়াম পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেওয়া

হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস হতে উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলো, সে বঞ্চিত হলো (মহা কল্যাণ হতে)।

হাদিসে এসেছে-

،إن في الجنة بابا يقال له :الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم

يقال :أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أعلق على يدخل منه أحد

জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে রইয়ান নামে। কেয়ামত দিবসে রোজাদারগণ উক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট হবেন; তারা ব্যতীত কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে না। বলা হবে: রোজাদারগণ কোথায়? তখন তারা দণ্ডায়মান হবেন, তারা ব্যতীত এ দরজা দিয়ে অপর কেউ প্রবেশ করবে না। তারা প্রবিষ্ট হওয়ার পর সে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অপর কেউ তাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে না

রামাদানের বিধান বর্ণনা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানে সাহাবিদের নানা বিধান সম্পর্কে অবগত করাতেন, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ঋজু পথ আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করতেন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে উল্লেখিত অনেক হাদিস ও হাদিসাংশ এ বিষয়ের উত্তম প্রমাণ। কারণ, যে কোন বিষয়ের মৌলিক খুঁটি হচ্ছে সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করা, এবং পরবর্তী সময়ে সে-অনুসারে আমল করা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত নয়-এমন আমল পরিত্যাজ্য সর্বার্থে। গ্রহণযোগ্য কেবল সে আমলই, যার ভিত্তি অতি মজবুত, যার আচরিত কর্মপন্থা নির্ভুল।

ইলম, আমল, ও দাওয়াতি ক্ষেত্রে যে নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, গ্রহণযোগ্য কেবল তার আমলই।

রামাদানে নবীজির ইবাদতঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে ইবাদতে অত্যন্ত মনোযোগী হতেন। তিনি এ মাসকে আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং গুনাহ মাফের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ."

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি ঈমান এবং সাওয়াবের আশায় রমযানের রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"

(সহীহ বুখারী: ৩৮, সহীহ মুসলিম: ৭৬০)

১. নবীজির সিয়াম পালন

রমযানে নবীজী সিয়ামের বিধান অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতেন এবং সাহাবীদেরও উৎসাহিত করতেন।

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ" :مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ رَمَضَانَ."

“আনাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান ছাড়া অন্য কোনো মাস পুরো রোজা রাখতেন না।”

(সহীহ বুখারী: ১৯৭০, সহীহ মুসলিম: ১১৫৬)

২. ইফতারে নবীজির দোয়া

নবীজি ﷺ ইফতারের সময় বিশেষ দোয়া পড়তেন এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করতেন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ" :ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ."

“ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফতারের সময় বলতেন: ‘তৃষ্ণা মিটে গেছে, শিরাগুলো ভিজে গেছে, এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।’”

(আবু দাউদ: ২৩৫৭)

৩. রমযানে মিসওয়াক ব্যবহার

রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক ব্যবহার করতেন, যা সিয়ামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ" :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ السِّوَاكَ."

“আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহার করতেন।”

(সহীহ বুখারী: ৮৮৮)

৪. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মাথায় পানি দেওয়া

রমযানে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মাথায় পানি ঢালার অনুমতি রয়েছে।

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه" :أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ."

“আবু বকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় তৃষ্ণার্ত হলে মাথায় পানি ঢালতেন।”

(আবু দাউদ: ২৩৬৫)

৫. কুলকুচা ও নাকে পানি দেওয়া

সিয়াম অবস্থায় কুলকুচা করা ও নাকে পানি দেওয়া জায়েয, তবে বেশি গভীর করা যাবে না।

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :"بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا."

“লাক্বীত ইবন সাবিরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত: নবীজি ﷺ বলেছেন: ‘নাকে পানি টেনে নাও, তবে যদি রোজাদার হও তবে সাবধান থেকো।”

(আবু দাউদ: ১৪২)

৬. রমযানে নবীজির সফর

রমযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো সফরে ছিলেন এবং সফরে রোজা ভেঙে রাখার অনুমতি দিয়েছেন।

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ" :كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ."

“আনাস (রা.) বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সফরে যেতাম। যারা রোজা রাখত তারা রোজা না রাখা ব্যক্তিদের নিন্দা করত না এবং যারা রোজা ভাঙত তারা রোজাদারদের নিন্দা করত না।”

(সহীহ মুসলিম: ১১১৮)

৭. রমযানে নবীজির কিয়ামুল লাইল

রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানে তারাবিহ ও তাহাজ্জুদ পড়তেন।

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ."

“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত: নবীজি ﷺ বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রমযানে রাতে নামাজ (কিয়ামুল লাইল) আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’”

(সহীহ বুখারী: ৩৭, সহীহ মুসলিম: ৭৫৯)

৮. রমযানের শেষ দশক ও লাইলাতুল কদর

শেষ দশকে নবীজি ইবাদতে আরও বেশি মগ্ন হতেন এবং পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ" :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ."

“আয়েশা (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ দশকে কোমর বেঁধে নিতেন, রাত জাগ্রত থাকতেন এবং পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন।”

(সহীহ বুখারী: ২০২৪)

৯. রমযানে নবীজির ইতিকাফ

রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশকে নিয়মিত ইতিকাফ করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها" :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ."

“আয়েশা (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।”

(সহীহ বুখারী: ২০২৬)

১০. নবীজির বিনয়, জুহদ ও সাদাকা

রমযানে রাসূলুল

্লাহ ﷺ আরও বেশি দান করতেন।

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ.

“রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার। আর রমযানে তিনি সবচেয়ে বেশি উদারতা প্রদর্শন করতেন।”

(সহীহ বুখারী: ৬)

নবীজির (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তাঁর স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসা, স্নেহময় আচরণ এবং শিক্ষাদানের চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়। রমযানের

মাসে এই আচরণ আরও বিশেষভাবে প্রকাশ পেত। এখানে রমযানে নবীজির স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণ এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলো আরবি হাদিসসহ তুলে ধরা হলো:

রমযানে স্ত্রীদের সাথে নবীজির আচরণঃ

রমযানে নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের প্রতি আরও বেশি যত্নশীল ও স্নেহপূর্ণ থাকতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ."

"আয়েশা (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ রোজা অবস্থায় তাঁর কোনো স্ত্রীর সঙ্গে চুম্বন করতেন।"

(সহীহ বুখারী: ১৮২৬, সহীহ মুসলিম: ১১০৬)

ব্যাখ্যা:

এটি নবীজির নম্রতা ও স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তবে এটি নিয়ন্ত্রিত আবেগ ও পরহেজগারির নিদর্শন।

১. রমযানে স্ত্রীদের শিক্ষাদান

রমযানে নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ধর্মীয় জ্ঞান ও ইবাদতের শিক্ষা দিতেন।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَدْعِيَةً نَدْعُو بِهَا فِي رَمَضَانَ."

"উম্মে সালমা (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ আমাদের রমযানে বিশেষ দোয়া শিখাতেন।"

(তিরমিজি: ৩৫২২)

২. নবীজি সম্পর্কে স্ত্রীদের অবগতি

স্ত্রীরা নবীজির আচার-ব্যবহার, ইবাদত এবং পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ তথ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যা উম্মাহর জন্য শিক্ষণীয়।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ."

"আয়েশা (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ তাঁর পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন।"

(সহীহ বুখারী: ৬০৩৯)

৩. কল্যাণ-কর্মে উৎসাহ প্রদান

রমযানে নবীজি ﷺ স্ত্রীদের দানশীলতা এবং সৎকর্মে উৎসাহ দিতেন।

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُرَغِّبُنَا فِي الصَّدَقَةِ فِي رَمَضَانَ."

"জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ আমাদের রমযানে সদকা করতে উৎসাহিত করতেন।"

(সহীহ মুসলিম: ১০০০)

৪. নবীজির সাথে ইতিকাফের অনুমতি

নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ইতিকাফে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতেন এবং তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "اعْتَكَفَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ فِي رَمَضَانَ."

"আয়েশা (রা.) বলেন: নবীজির স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে রমযানে ইতিকাফ

করতেন।”

(সহীহ বুখারী: ২০২৭, সহীহ মুসলিম: ১১৭২)

৫. নবীজির সাথে সম্মিলিত ইবাদত

নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে রাতে সালাত আদায় করতেন এবং ইবাদতের জন্য উৎসাহ দিতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ" :صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِأَهْلِهِ فِي لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ."

“আয়েশা (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ রমযানের এক রাতে তাঁর পরিবারের সঙ্গে নামাজ আদায় করেন।”

(তিরমিজি: ৮০৫)

৬. স্ত্রীদের সঙ্গে নবীজির বন্ধু-সুলভ আচরণ

স্ত্রীদের সঙ্গে নবীজি ﷺ সর্বদা বিনয়ী, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ" :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَابِقُنِي."

“আয়েশা (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ আমার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন।”

(আবু দাউদ: ২৫৭৮)

৭. ইতিকাফে নবীজির স্ত্রীদের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন

ইতিকাফে থাকা অবস্থায় নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رضي الله عنها قَالَتْ" :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا فَزُرْتُهُ لَيْلًا."

“সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ ইতিকাফে ছিলেন। আমি তাঁকে রাতে দেখতে গিয়েছিলাম।”

(সহীহ বুখারী: ২০৩৫)

৮. নবীজির স্ত্রী-সেবা গ্রহণ

রমযানে নবীজি ﷺ স্ত্রীদের সেবা গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের ভালোবাসা ও সম্মান দিতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ" :كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ."

“আয়েশা (রা.) বলেন: আমি নবীজির মাথার চুল আঁচড়াতাম, যখন তিনি ইতিকাফে থাকতেন।”

(সহীহ বুখারী: ২০২৮)

৯. রমযানে নবীজির বিবাহ

রমযানে নবীজি ﷺ এর বিবাহের কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা হাদিসে উল্লেখ নেই। তবে তিনি এই মাসকে ধর্মীয় আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করতেন।

নবীজির (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযানের সময় উম্মতের সঙ্গে আচরণ, শিক্ষা, এবং ইবাদতের নেতৃত্ব ছিল তাঁর আদর্শিক জীবনধারার অনন্য দৃষ্টান্ত। নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো আরবি হাদিসসহ বিশ্লেষণ করা হলো:

রমযানে উম্মতের সাথে নবীজির আচরণঃ

নবীজি ﷺ রমযানে উম্মতের জন্য আরও বেশি দোয়া করতেন এবং তাদের প্রয়োজন ও কল্যাণে নিবেদিত থাকতেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه" :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ."

"জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার, আর তিনি রমযানে আরও বেশি উদারতা প্রদর্শন করতেন।"

(সহীহ বুখারী: ৬)

১. সাহাবিদের শেখানো

নবীজি ﷺ সাহাবিদের সিয়ামের গুরুত্ব, নিয়ম এবং রমযানের বিশেষ ইবাদত সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :"إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ."

"আবু হুরাইরা (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ বলেছেন: রমযান এলে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।"

(সহীহ বুখারী: ১৮৯৯, সহীহ মুসলিম: ১০৭৯)

২. সৎকর্মে সাহাবিদের সর্বাত্মক নিয়োগ

নবীজি ﷺ রমযানে সাহাবিদের বেশি বেশি সদকা, ইবাদত, এবং কুরআন তিলাওয়াতে উৎসাহ দিতেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ" :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ فِي رَمَضَانَ."

"ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ রমযানে আমাদের নেক কাজের ফজিলত স্মরণ করিয়ে দিতেন।"

(মুসনাদ আহমদ: ২১২)

৩. রমযানে বিভিন্ন সমস্যার শরয়ি সমাধান প্রদান

নবীজি ﷺ রমযানে সাহাবিদের রোজা ও ইবাদতসংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ" :هَلْ أَفْطَرْتُ؟ "فَقَالَ" :لَا، وَلَكِنْ تَجَنَّبْ ذَلِكَ."

"আনাস (রা.) বলেন: এক ব্যক্তি নবীজি ﷺ এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল: 'আমি কি রোজা ভেঙেছি?' নবীজি বললেন: 'না, তবে এ কাজ থেকে বিরত থাক।'"

(আবু দাউদ: ২৩৬৩)

৪. নবীজির ইমামতি

নবীজি ﷺ রমযানে সাহাবিদের তারাবিহ এবং অন্যান্য নামাজে ইমামতি করতেন।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ :صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ."

"আবু জর (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ আমাদের রমযানের এক রাতে নামাজে ইমামতি করেছিলেন।"

(সহীহ বুখারী: ১১২৯, সহীহ মুসলিম: ৭৫৮)

৫. নবীজির আলোচনা ও খুতবা প্রদান

নবীজি ﷺ রমযানে বিশেষভাবে খুতবা দিতেন এবং সাহাবিদের রমযানের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন।

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه، قَالَ :خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ وَقَالَ" :قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ."

"সালমান ফারসি (রা.) বলেন: শাবানের শেষ দিনে নবীজি ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন এবং বললেন: 'তোমাদের কাছে একটি মহান মাস চলে এসেছে।'"

(ইবনে মাজাহ: ১৬৪4)

৬. সিয়াম সম্পর্কে নবীজির নির্দেশনা

নবীজি ﷺ রমযানে সিয়ামের বিধি ও গুরুত্ব নিয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" :الصِّيَامُ جُنَّةٌ."

"আবু হুরাইরা (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'সিয়াম (রোজা) ঢালস্বরূপ।'"

(সহীহ বুখারী: ১৮৯৪)

৭. লাইলাতুল কদর অনুসন্ধানে উৎসাহ

নবীজি ﷺ সাহাবিদের লাইলাতুল কদর খুঁজতে উৎসাহিত করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ" :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ."

"আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত: নবীজি ﷺ বলেছেন: 'শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো।'"

(সহীহ বুখারী: ২০১৭, সহীহ মুসলিম: ১১৬৯)

৮. নিষিদ্ধ কর্মে বাধাপ্রদান

নবীজি ﷺ সাহাবিদের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ" :مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ."

"আবু হুরাইরা (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ বলেছেন: 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করে না, তার রোজা রাখায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।'"

(সহীহ বুখারী: ১৯০৩)

৯. না-ছোড়দের শিক্ষাদান

নবীজি ﷺ শিশু ও কিশোরদের রমযানের গুরুত্ব বুঝাতেন এবং তাদের সহজ কাজ শেখাতেন।

".عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ" :كُنَّا نُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا

“রুবাই বিনতে মুআব্বিয (রা.) বলেন: আমরা আমাদের শিশুদের রোজা রাখতে অভ্যস্ত করতাম।”
(সহীহ বুখারী: ১৯৬০)

১০. ফিতরা আদায়ের আদেশ

নবীজি ﷺ রমযানের শেষে ফিতরা আদায়ের নির্দেশ দিতেন।

**ع

**".نْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه" :فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ

“ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরা আদায়কে ফরজ করেছেন।”
(সহীহ বুখারী: ১৫০৩)

১১. কিছু কাজে অন্যদের দায়িত্ব দেওয়া

নবীজি ﷺ সাহাবিদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিতেন এবং তাদের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ দিতেন।

".عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه" :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :خُذُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ

“মু’আয (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ বললেন: ‘যে নির্দেশ তোমাদের দিয়েছি, তা গ্রহণ করো।’”
(সহীহ বুখারী: ৭২৬৭)

১২. অব্যাহত ইবাদাতের উৎসাহ প্রদান

নবীজি ﷺ সাহাবিদের ধারাবাহিক ইবাদত ও দোয়া করার উৎসাহ দিতেন।

".عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ" :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالْقِيَامِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

“আবু হুরাইরা (রা.) বলেন: নবীজি ﷺ প্রতি রাতে আমাদের কিয়ামের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।”
(তিরমিজি: ৮০১)

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য রোজা

রোজা মুসলমানদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ফরজ ইবাদত। রমজান মাসে রোজা রাখার মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর কাছে আত্মশুদ্ধি, তাওবা, ধৈর্য, এবং তাকওয়া অর্জন করতে পারে। তবে, ইসলামে কিছু শর্তাবলী ও বিধান রয়েছে, যা অনুযায়ী মুসলিমদের রোজা রাখতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে সাধারণ শর্তাবলী, অসুস্থ বা বিশেষ অবস্থায় থাকা মানুষের জন্য বিশেষ বিধান, এবং মুসাফিরদের জন্য রোজার নিয়ম। এখানে রোজার বিধান, উপকারিতা এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে রোজা রাখার বিধান সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে, হাদিসসহ।

রোজার বিধান ও শর্তাবলী

রোজা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি, যা রমজান মাসে ফরজ করা হয়েছে। রোজা রাখার কিছু নির্দিষ্ট শর্তাবলী রয়েছে, যা পূরণ করতে হবে।

1. **ইসলামিক বিশ্বাসী হতে হবে:** রোজা রাখা শুধু মুসলিমদের জন্য ফরজ। কাফির বা অমুসলিমদের উপর রোজা ফরজ নয়।

2. **বয়ঃসন্ধি পূর্ণ হওয়া:** শিশুদের উপর রোজা ফরজ নয়। সাধারণত **১২** বছর বয়স বা তার বেশি বয়স হলে রোজা রাখা ফরজ হয়।

3. **স্বাস্থ্যবান হওয়া:** অসুস্থ ব্যক্তি বা কোনো শারীরিক সমস্যা থাকলে রোজা রাখা তাদের জন্য ফরজ নয়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, যদি সুস্থ হওয়া সম্ভব হয়, তবে পরে রোজা রাখা সম্ভব।

4. **পবিত্রতা:** মাকরুহ বা হারাম কাজ, যেমন বেহায়াপনা বা মিথ্যা কথা বলা, রোজার কার্যকারিতা নষ্ট করতে পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“যে ব্যক্তি রমজান মাসের রোজা ইমান ও সওয়াবের জন্য রাখবে, তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে।”

— (সহিহ বুখারি)

এই হাদিসটি রোজার ফরজ বিধান এবং এর প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।

রোজা রাখার উপকারিতা

রোজার মাধ্যমে একজন মুসলিম শুধু শারীরিকভাবে উপকার লাভ করে না, বরং এটি তার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতির পথও উন্মুক্ত করে। রোজা রাখার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা নিম্নরূপ:

1. **আত্মশুদ্ধি:** রোজা একজন মুসলিমকে আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মশুদ্ধির জন্য সুযোগ দেয়। এটি মানুষের মধ্যে আত্মসংযম এবং ধৈর্যের গুণাবলী তৈরি করে।

2. **ধৈর্য ও সহনশীলতা:** রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার শরীর এবং মনের নিয়ন্ত্রণ শেখে। এটি তাকে পাপ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত রাখে।

3. **আধ্যাত্মিক উন্নতি:** রোজার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং ঈমান শক্তিশালী হয়। এটি মুসলিমকে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের সুযোগ দেয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"রোজা একটি ঢাল, যা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে।"

— (সহিহ বুখারি)

এটি প্রমাণ করে যে, রোজা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উপায় নয়, বরং এটি একজন মুসলিমের আত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির জন্য একটি মহৎ উপকরণ।

শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের জন্য রোজা

ইসলামে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের জন্য রোজা রাখার বিধান আলাদা।

1. **শিশুদের জন্য রোজা:** সাধারণত, ১২ বছর বয়সের নিচে শিশুদের উপর রোজা ফরজ নয়। তবে, তারা যদি স্বেচ্ছায় রোজা রাখে, তবে তাদেরকে উৎসাহিত করা যেতে পারে, কিন্তু তাদের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"যখন শিশুদের বয়স ৭ বছর হয়, তখন তাদের নামায আদায়ের জন্য নির্দেশ দাও, এবং ১০ বছর বয়সে নামায না পড়লে তাদের শাস্তি দাও।"

— (সহিহ বুখারি)

এই হাদিসটি শিশুদের প্রতি দায়িত্ব এবং ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব বোঝায়, কিন্তু রোজা রাখা শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

2. **বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের জন্য রোজা:** যে ব্যক্তি বয়ঃকন্দলী বা গুরুতর অসুস্থ, এবং তার অসুস্থতা এমন যে তার পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব নয়, তারা রোজা রাখতে বাধ্য নয়। তাদের জন্য কুফফারা বা অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"যে ব্যক্তি অসুস্থ বা বয়স্ক হয়ে রোজা রাখতে সক্ষম নয়, সে তার প্রতিটি রোজার জন্য ফিদিয়া দিতে পারে।"

— (সহিহ মুসলিম)

ফিদিয়া হলো, অসুস্থ বা বয়স্ক ব্যক্তি যদি রোজা রাখতে অক্ষম থাকে, তবে তাকে প্রতিটি রোজার জন্য একটি গরিবকে খাদ্য প্রদান করতে হবে।

মুসাফিরদের জন্য রোজা

মুসাফির বা ভ্রমণকারী ব্যক্তির জন্য রোজা রাখার বিধান বিশেষভাবে শিথিল করা হয়েছে। রমজান মাসে, যারা ভ্রমণরত অবস্থায় থাকে, তাদের উপর রোজা রাখা ফরজ নয়, তবে তারা পরবর্তীতে তা পুষিয়ে নিতে পারে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَإِذَا صُمْتُمْ فَجْمَعُواْ فُرُوجَكُمْ

"আর তোমরা রোজা রাখো, তবে যদি ভ্রমণে থাকো, তবে তোমাদের জন্য রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে।"

— (সূরা আল-হাদিদ)

মুসাফিরদের জন্য ইসলামে কিছু নমনীয়তা রয়েছে, তবে ভ্রমণ শেষে তাদের অবশ্যই পুষিয়ে নিতে হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"যদি কোন ব্যক্তি ভ্রমণরত অবস্থায় থাকে, তবে তার উপর রোজা রাখা ফরজ নয়।"

— (সহিহ মুসলিম)

এটি স্পষ্ট করে যে, ভ্রমণকারী ব্যক্তির জন্য রোজা রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে, তিনি পরবর্তী সময়ে ওই রোজাগুলি পরিপূর্ণ করবেন।

তারাবীর নামাযে যত্নবান হই

রমযান মাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল তারাবীর নামায। **আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-**

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি রমযান মাসে সওয়াবের আশায় কিয়ামে রমযান আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৯

আরো একাধিক হাদীসে কিয়ামে রমযান তথা তারাবীর নামাযের কথা বর্ণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে এ সুন্নতের ওপর আজও মুসলিম উম্মাহর আমল চলে আসছে। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে মুসলিম জনপদগুলোতে রমযান মাসে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তারাবী আদায় করা হচ্ছে। রাসূলের সুন্নাহ অনুসারী কোনো মুসলিম কখনো এ আমলকে গুরুত্বহীন বা কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি। কিন্তু আজকাল দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের মতো অনেকের মধ্যে এ মহান আমলের প্রতিও গুরুত্বহীনতা ও অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোনো কোনো ভাইকে দেখা যায়, নিজের মনমতো যেদিন যত রাকাত ইচ্ছা পড়ে নেয়। কেউ আবার জামাতে শরীক না হয়ে একা একা কিছু রাকাত পড়ে নেয়, কেউ তো মোটেই পড়ে না। অথচ তারাবীর নামায সুন্নতে মুআক্কাদা। **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-**

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর রমযানের সিয়াম ফরয করেছেন এবং আমি (আল্লাহ তাআলার হুকুমে) কিয়ামে রমযান (অর্থাৎ তারাবীর নামায)-এর বিধান জারি করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সওয়াবের উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখবে এবং রাতে নামায (তারাবী) পড়বে সে যাবতীয় গুনাহ থেকে নবজাতক শিশুর মতো পবিত্র হয়ে যাবে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৬০, ১৬৮৮; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২২১০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩২৮

অত্যন্ত সওয়াবের এ আমলে নিজের খেয়ালখুশি মতো কম করা মূলত নামাযের প্রতিই অবহেলা-অনাগ্রহের প্রকাশ এবং এর মন্দ প্রভাবও সুদূরপ্রসারী। মুসলিম ঐতিহ্যের এ মহান আমলকে কম গুরুত্বের মনে করে এ ব্যাপারে অবহেলা করতে থাকলে আল্লাহ না করুন, আমাদের কুপ্রবৃত্তি ধীরে ধীরে আমাদেরকে এ সুন্নত থেকে পুরোপুরিই উদাসীন করে ফেলতে পারে।

মনে রাখা দরকার, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার নেক আমলের সওয়াব এমনিতেই বহু গুণে বাড়িয়ে দেন। রমযান তো আরো মর্যাদাপূর্ণ মাস। এ মাসের ফযীলত ও আমলের সওয়াবও

অন্য সময়ের চেয়ে বেশি। কাজেই আমরা আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব অর্জনের এ সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাই এবং এর যথাযথ কদর করি।

তারাবীর নামাযের ব্যাপারে আমাদের কোনো কোনো ভাইয়ের উদাসীনতার একটা বড় কারণ হল, তারাবীর নামাযের বিধান এবং এর রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিগত শতাব্দী থেকে কোনো কোনো মহল কর্তৃক বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপপ্রয়াস। অথচ তাদের বক্তব্যের কোনো দালীলিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তারা যেসকল বর্ণনা দ্বারা দলীল দিতে চেষ্টা করে, তা তাদের বোঝার ভুল। যা উলামায়ে উম্মত বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করেছেন। আর ঐতিহাসিকভাবে তো তাদের কোনোই দলীল-প্রমাণ নেই। সে আলোচনা এখানে বাঞ্ছনীয় নয়। মূলত এক্ষেত্রে অযথা বাড়াবাড়িই তাদের মতবিরোধের মূল কারণ।

তাদের এম প্রোপাগান্ডার ফলে কারো কারো কাছে তারাবীর নামাযের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। অথচ সালাফের যুগ থেকে অনুসৃত সকল ইমামের ঐক্যমতে তারাবীর নামায সুন্নতে মুআক্কাদা এবং তা বিশ রাকাত। হাজার বছর ধরে এর ওপরেই আমল হয়ে আসছে। (দ্র. জামে তিরমিযী ১/১৬৬; আলমুহীতুল বুরহানী ২/২৪৯; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৩৪-২৩৫; আলমুগনী ১/৮৩৩)

তারাবীর নামাযের প্রচলন সম্পর্কে আপাতত কেবল এতটুকু উল্লেখ করছি, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরপর তিন দিন কিয়ামে রমযান তথা তারাবীর নামায জামাতের সাথে আদায় করেছেন। চতুর্থদিন যখন দেখলেন, তারাবীর জামাতে শরীক হতে সাহাবায়ে কেরাম প্রায় সকলেই মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন। তখন আর জামাত করেননি। পরদিন ফজর নামাযের পরে সবার উদ্দেশে বললেন, 'আমি তোমাদের আগ্রহ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি, এতে করে এ নামায তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে, তখন তোমাদের জন্য তা আদায় করা কষ্টকর হবে। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১১, ১০১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬১)

উক্ত আশঙ্কায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারাবীর নামাযের সম্মিলিত জামাতের ব্যবস্থা করেননি। আবু বকর রা.-এর দুই বছরের খেলাফতকালেও তারাবীর সম্মিলিত জামাতের ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে ছোট ছোট জামাতে তারাবী আদায় করা হত। উমর রা. তাঁর খেলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামের সম্মতিতে তারাবীর সম্মিলিত জামাতের ব্যবস্থা করেন। তিনি দেখলেন, মসজিদের বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদাভাবে তারাবীর জামাত হচ্ছে। তিনি সবাইকে নিয়ে একত্রে একটি জামাতের ব্যবস্থা করতে চাইলেন। তখন উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর ইমামতিতে সকলের একত্রে তারাবী আদায়ের ব্যবস্থা করলেন। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১০)

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (মৃত্যু : ৪৬৩ হি.) বলেন, উমর রা. নতুন কোনো কিছুর প্রচলন ঘটাননি। তারাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন এবং জামাতেও পড়েছেন। কিন্তু এই আশঙ্কায় নিয়মিত জামাতের ব্যবস্থা করেননি যে, তিনি জামাতের ব্যবস্থা

করলে তা উম্মতের জন্য ফরয হয়ে যেতে পারে। তবে নবীজীর এটি পছন্দ ছিল। তাঁর পছন্দ অনুযায়ীই উমর রা. এ সুন্নত নিয়মিত জামাতে আদায়ের ব্যবস্থা করেন। -আততামহীদ ৮/১০৮-১০৯

কাছাকাছি ধরনের কথা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.-ও বলেছেন। (দ্র. ফাতহুল বারী ৪/২৯৭)

সেসময় অসংখ্য সাহাবী জীবিত ছিলেন। যাদের মধ্যে আলী রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., মুআয ইবনে জাবাল রা., তামীম দারী রা. প্রমুখ। তারা কেউই উমর রা.-এর এ ব্যবস্থাপনার বিরোধিতা করেননি। কারণ তাদের কাছে এ বিষয়টি নতুন কিছু ছিল না। এটি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় ছিল তা তারাও জানতেন। কাজেই এ কথা ভালোভাবে বুঝতে হবে। বিষয়টি এমন নয় যে, উমর রা. তারাবী নামাযের প্রচলন শুরু করেছেন। তারাবী তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই সুন্নত। তখন থেকেই সাহাবায়ে কেরাম ছোট ছোট জামাতে তারাবী আদায় করতেন। উমর রা. কেবল নিয়মতান্ত্রিকভাবে সকলের একসঙ্গে বড় জামাতে তারাবী আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম সকলেই তাঁর এ ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন করেছেন। উমর রা. কে ছিলেন তা তো সকলেরই জানা রয়েছে। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ। আর খুলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এই ওসীয়ত করেছেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

সুতরাং তোমরা আমার ও আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নতকে আঁকড়ে রাখবে। একে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে প্রাণপণে কামড়ে ধরে থাকবে...। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৭৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭১৪২, ১৭১৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ০৫

এরপর থেকে সর্বত্রই বিশ রাকাত তারাবী জামাতের সাথে আদায় হতে থাকে। বহু তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী থেকে একথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আবদুল আযীয ইবনে রুফাই, ইয়াযীদ ইবনে রূমান, ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ আলআনসারী, আবু আবদুর রহমান আসসুলামী, ইবরাহীম নাখায়ী, আতা ইবনে আবী রবাহ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ। (দ্র. সুনানে কুবরা, বাইহাকী ২/৪৯৬-৪৯৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৩৯৩; কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আলমারওয়াযী, পৃষ্ঠা ২০০-২০২; আলইসতিযকার, ইবনে আবদুল বার ৫/১৫৭; আলমুগনী, ইবনে কুদামা ১/৮৩৩; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী ৪/২৯৫-২৯৯; আলইখতিয়ার লি-তালীল মুখতার ১/১২২-১২৩)

তারাবী নামাযের প্রচলন সম্পর্কে জানতে এবং এর রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের অপপ্রচার ও তার খণ্ডন জানতে উলামায়ে কেরাম মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী রাহ.-এর লেখা 'রাকআতে তারাবী' এবং ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আলআনসারী

রাহ.-এর লেখা 'তাসহীহু হাদীসি সালাতিত তারাবী ইশরীনা রাকআতান' রিসালাদুটি মুতালাআ করতে পারেন। আর আলেমগণসহ সর্বসাধারণ সকলেই মাসিক আলকাউসার পত্রিকার অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর লেখা 'তারাবীর গুরুত্ব, ফযীলত ও রাকাত সংখ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়তে পারেন; যা মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে 'সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবীর রাকাআত সংখ্যা' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

কিছু জরুরি মাসআলা

১. তারাবীর নামায নারী-পুরুষ সকলের জন্যই সুন্নতে মুআক্কাদা। -আলমুহীতুল বুরহানী ২/২৪৯; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৩৪-২৩৫; রদ্দুল মুহতার ২/৪৩

২. তারাবীর নামায দুই রাকাত করে বিশ রাকাত পড়া সুন্নত। প্রত্যেক চার রাকাতের পরে কিছুক্ষণ বিরতি দেবে। এই বিরতিকে আরবীতে বলে 'তারবীহা'। এ সময় তাসবীহ-তাহলীল পড়া বা চুপ থাকা সবই জায়েয। এ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দুআ কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। -আলবাহরুর রায়েক ২/৬৯; রদ্দুল মুহতার ২/৪৫-৪৬

৩. তারাবীর নামাযে দ্বিতীয় রাকাতের পরে তাশাহহুদ পড়ে ভুলে দাঁড়িয়ে গিয়ে আরো দুই রাকাত মিলিয়ে পড়ে নিলে চার রাকাতই তারাবী হিসেবে গণ্য হবে। এজন্য সাহু সিজদা লাগবে না। কিন্তু তাশাহহুদের জন্য না বসেই আরো দুই রাকাত মিলিয়ে পড়লে শুধু শেষ দুই রাকাত সহীহ হবে। এক্ষেত্রে প্রথম দুই রাকাত পুনরায় পড়তে হবে এবং খতম তারাবী হলে ওই দুই রাকাতে পঠিত কেরাতও পুনরায় পড়তে হবে। দুই রাকাতের পরে ভুলে না বসে তৃতীয় রাকাত পূর্ণ করে সালাম ফেরালে ওই নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে সিজদায় যাওয়ার আগে যখনই স্মরণ হবে বসে পড়বে এবং সাহু সিজদা দিয়ে নামায শেষ করবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ২/২৫৭-২৫৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১৭-১১৮

৪. মদ-গুন্নাহ যথাযথভাবে আদায় হয় না এবং উচ্চারণ বুঝে আসে না- এত তাড়াতাড়ি কেরাত পড়া সব সময়ের মতো তারাবীতেও মাকরূহ। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১৭

৫. কেউ কেউ তারাবীর জামাতের সময় প্রথম রাকাতে বসে থেকে ইমামের রুকুতে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। এমনটি করা মাকরূহ। -ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৪৪; আলবাহরুর রায়েক ২/৬৯; রদ্দুল মুহতার ২/৪৮

৬. তারাবীতেও নাবালেগের পেছনে বালেগের ইকতিদা জায়েয নেই। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১৭

৭. রমযান মাসে বিতির নামায জামাতের সাথে পড়া মুস্তাহাব। -রদ্দুল মুহতার ২/৪৯

৮. দাঁড়িয়ে তারাবী পড়ার শক্তি থাকলে বসে পড়া মাকরূহ। -ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৪৩; রদ্দুল মুহতার ২/৪৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১৮

৯. তারাবীর জামাত কয়েক রাকাত হয়ে যাওয়ার পরে কেউ এসে উপস্থিত হলে সে আগে এশার নামায ও সুন্নত পড়বে, এরপরে তারাবীর জামাতে শরীক হবে। তারাবীর জামাতের পরে সম্ভব হলে সে আগে একাকী বাকি তারাবী আদায় করে নেবে, তারপরে বিতিরের জামাতে শরীক হবে। যদি বিতিরের জামাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে আগে বিতিরের জামাতে শরীক হবে, এরপর বাকি তারাবী আদায় করবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ২/২৬৩; রদ্দুল মুহতার ২/৪৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১৭

১০. অন্যান্য ফরয নামাযের মতো তারাবীও মহিলারা নিজ ঘরেই পড়বে। খতম তারাবীর জন্য মসজিদে যাবে না। যদি তাদের মাহরাম কোনো পুরুষ ঘরে খতম তারাবী পড়ে, তাহলে তার পেছনে যথানিয়মে ইকতিদা করতে পারে।

ইতিকাফ : আল্লাহর নৈকট্য লাভের মহিমান্বিত ইবাদত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হল ইতিকাফ।

দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততাকে পাশে ঠেলে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহর ঘর মসজিদে অবস্থানের এই যে বিধান- নিঃসন্দেহে তা বান্দার প্রতি রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় ইহসান। বান্দার উচিত এই মহান বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং আবেগ ও মহব্বতের সাথে এই আমলের প্রতি উৎসাহী হওয়া।

দুনিয়ার জীবন ব্যস্ততাবহুল। জীবনের সকল অনুষঙ্গই এমন, যা মানুষের ধ্যান ও চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, স্বপ্ন, কর্ম, লক্ষ্য ইত্যাদি বহু বিষয় মানুষকে শতধা-বিক্ষিপ্ত করে রাখে। তাই সহজেই সুযোগ হয় না পরকালীন জীবন নিয়ে ভাবার; কিংবা একান্ত মনোযোগের সাথে ইবাদতে মগ্ন হওয়ার। ইতিকাফ সেই সুযোগকেই অবারিত করে। বান্দাকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হতে সাহায্য করে।

ইসলামে ইতিকাফের বিধান অনেক প্রাচীন। **কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-**

وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤی اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآىِٕفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে সেইসকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু ও সিজদা করবে। -সূরা বাকারা (২) : ১২৫

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইতিকাফের বিধান হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.-এর যামানাতেও ছিল।

তাছাড়া এক হাদীসে এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ইতিকাফের মান্নত করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে নবীজী তাকে সেই মান্নত পুরা করার নির্দেশ দেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৩

ইতিকাফের পরিচয় ও প্রকার

ইতিকাফ আরবী শব্দ। যার অর্থ হল, অবস্থান করা, অভিমুখী হওয়া, নিবেদিত হওয়া, নিরবচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি।

পরিভাষায় ইতিকাফ হল, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততাকে গুটিয়ে, এমন মসজিদে অবস্থান করা, যেখানে জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হয়।

ইতিকাফ তিন প্রকার :

১. সুন্নত ইতিকাফ।

রমযানের শেষ দশকে একুশ তারিখের রাত [অর্থাৎ ২০ তারিখ সূর্যাস্তের আগ] থেকে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত ইতিকাফ করা।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর এ দিনগুলোতে ইতিকাফ করতেন, তাই একে সুন্নত ইতিকাফ বলা হয়।

২. নফল ইতিকাফ।

রমযানের শেষ দশকে পূর্ণ দশ দিনের কম ইতিকাফ করা। অথবা বছরের অন্য যেকোনো সময় যতক্ষণ ইচ্ছা, ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা।

৩. ওয়াজিব ইতিকাফ।

মান্নতকৃত ইতিকাফ এবং সুন্নত ইতিকাফ ফাসেদ হয়ে গেলে তার কাযা আদায় করা।

ইতিকাফের স্থান

সওয়াবের দিক থেকে ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হল মসজিদে হারাম। এরপর মসজিদে নববী। তারপর মসজিদে আকসা। এরপর যেকোনো জামে মসজিদ। তারপর যেকোনো পাঞ্জেগানা মসজিদ।

তবে নারীদের জন্য ইতিকাফের স্থান হল ঘরের নির্দিষ্ট কোনো স্থান। (দ্র. শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৪৭০; মাবসূত, সারাখসী ৩/১১৫; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৮০-২৮১; রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৯)

ইতিকাফের ফযীলত ও ফায়েদা

ইতিকাফ শিআরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি মাসনূন আমল। উপরন্তু রমযানের ফযীলত ও বরকত লাভ করার ক্ষেত্রে ইতিকাফের ভূমিকা অপরিসীম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদানী জীবনে কেবল একটি রমযানে (জিহাদের সফরে থাকার কারণে) ইতিকাফ করতে পারেননি। তাই পরবর্তী বছর ২০ দিন ইতিকাফ করে তা পূরণ করে নিয়েছেন। এছাড়া তিনি সব রমযানে ইতিকাফ করেছেন। সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে ইতিকাফে শরীক হয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكِفُ العشرَ الأواخِرَ من رمضانَ، فلم يعتكِفْ عاماً، فلما كان العامُ المُقْبِلُ اعتكفَ عشرينَ ليلةً.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর ইতিকাফ করতে পারেননি। পরবর্তী বছর বিশ রাত (দিন) ইতিকাফ করেছেন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৬৩

ইতিকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর লাভ করার সম্ভাবনাও অনেক বেশি থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর লাভের আশায় একবার রমযানের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করেন। এরপর কয়েকবার ইতিকাফ করেন মাঝের দশ দিন। এরপর একসময় শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতে শুরু করেন এবং ইরশাদ করেন-

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

তোমরা রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২০

আরো দ্রষ্টব্য : লাতাইফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা ৩৫৩

আরেক হাদীসে এসেছে-

كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ :مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا...

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের মাঝের দশ দিন ইতিকাফ করতেন। এক বছর এভাবে ইতিকাফ করার পর যখন রমযানের ২১তম রাত এল... তিনি ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে ইতিকাফ করেছে সে যেন শেষ দশকে ইতিকাফ করে। কারণ আমাকে শবে কদর সম্পর্কে অবগত করা হয়েছিল (যে, তা শেষ দশকের অমুক রাত।) এরপর তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ... সুতরাং তোমরা শেষ দশকে শবে কদর অন্বেষণ কর এবং প্রতি বেজোড় রাতে অন্বেষণ কর। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৭

ইতিকাফের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফায়দা হল- ইতিকাফকারী অত্যন্ত পবিত্র ও গোনাহমুক্ত পরিবেশে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে তার অবস্থানটিই এক ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। তাই সে অবসর সময়ে কোনো আমল না করলেও দিনরাত তার মসজিদে অবস্থান করাটাই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

এমনিভাবে ইতিকাফকারী দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে। আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিজেকে পূর্ণ প্রস্তুত করে আল্লাহ-অভিমুখী হয়। অভিজ্ঞজনমাত্রই জানেন, এটা যে কারো জন্য, যে কোনো সময় সহজেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া ইতিকাফের মাধ্যমে রোযার যাবতীয় হক ও আদাব রক্ষা করার তাওফীক হয়। সর্বোপরি ইতিকাফ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত একটি ইবাদত। যার ফায়েদা ও প্রভাব মানুষের মন ও মননে এবং জীবন ও জগতে অনেক গভীর হয়ে থাকে।

ইতিকাফের প্রস্তুতি

ইতিকাফের উদ্দেশ্যে মানুষ যেহেতু আল্লাহর ঘর মসজিদে আসে, সেজন্য মানবীয় সাধ্যের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে আসা উচিত। মনে রাখা উচিত, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূত-পবিত্র। আল্লাহর ঘর সর্বোচ্চ সম্মানিত ও পবিত্রতম স্থান। তাই প্রথমে নিজের বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করা উচিত। স্মরণ করা উচিত কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত-

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

হে আদম-সন্তানেরা! যখনই তোমরা কোনো মসজিদে আসবে, তখন নিজেদের শোভা অবলম্বন করবে (অর্থাৎ পোশাক পরে নেবে)। -সূরা আ'রাফ (০৭) : ৩১

এই আয়াতে পোশাক পরে তাওয়াফ ও নামায আদায়ের নির্দেশ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে উত্তম পোশাক পরার কথাও। যে পোশাক পবিত্র ও সুন্দর এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে শোভাবর্ধনকারী। [দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪০৫; তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ ২/৩৯২]

পাশাপাশি নিজের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া কাম্য। কেননা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ছাড়া বাহ্যিক পবিত্রতা থেকে কাঙ্ক্ষিক্ষত ফায়েদা লাভ করা যায় না। সেদিকেও ইশারা করা হয়েছে একটি আয়াতে -

يٰبَنِىۡۤ اٰدَمَ قَدۡ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسًا يُّوَارِىۡ سَوۡاٰتِكُمۡ وَ رِيۡشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقۡوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيۡرٌ .

হে আদম-সন্তানেরা! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং (ব্যবস্থা করেছি) সাজ-সজ্জার বস্তু। তবে তাকওয়ার যে পোশাক, সেটাই সর্বোত্তম। -সূরা আরাফ (৭) : ২৬

অর্থাৎ বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের দেহকে আবৃত করে রাখে, তেমনি তাকওয়ার পোশাক মানুষের গোনাহপ্রবণ স্বভাবকে আবৃত করে রাখে। আর দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের প্রতিফল- উভয়ক্ষেত্রেই তাকওয়ার পোশাক বেশি উপকারী। (দ্র. তাওযীহুল কুরআন, সংশ্লিষ্ট আয়াতের টীকা)

মোটকথা, আল্লাহর ঘরে হাজির হওয়ার আগে প্রথম কাজ হল, সার্বিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা। তওবার মাধ্যমে নিজের অতীত গোনাহ ক্ষমা করিয়ে নেওয়া এবং আল্লাহর ঘরের আদব রক্ষা করে থাকার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং কায়মনোবাক্যে দুআ করা।

এরপর নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের জন্য যতটুকু সামানা না হলেই নয়, সেটুকু নিয়ে আসা। কোনো সামানাপত্রের বিষয়ে যেন অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়- সেই দিকটিও খেয়াল রাখা।

সেইসাথে ইবাদতের চিন্তা ও মানসিকতা ধারণ করা। ধ্যান ও মনকে আল্লাহ-অভিমুখী করা এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তকে জাগরূক করা।

মসজিদের থাকার কিছু আদব

মসজিদ আল্লাহর ঘর। এ ঘরের মর্যাদা দুনিয়ার সকল ঘর থেকে বেশি। এ জায়গার সম্মান অন্য সকল জায়গার চেয়ে অধিক। হাদীস শরীফে এসেছে-

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.

আল্লাহ তাআলার কাছে সবচাইতে প্রিয় জায়গা হল মসজিদ। সবচাইতে অপ্রিয় জায়গা বাজার। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৭১

ইতিকাফের সময় মানুষ যেহেতু এই পবিত্র মর্যাদাপূর্ণ স্থানেই অবস্থান করে, তাই এ ঘরের সম্মান ও মর্যাদার কথা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখা উচিত।

হাদীস শরীফে মসজিদকে পবিত্র রাখার বিষয়েও জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। (দ্র. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৫)

তাই নিজের কারণে যেন মসজিদে কোনো অপবিত্রতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে সযত্ন খেয়াল রাখা।

মসজিদে যতক্ষণ থাকা হয়, ওযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা। হাদীস শরীফে এ বিষয়েও খুব গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করা হয়েছে। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৪৯)

এমনকি পেঁয়াজ, রসুন এবং এজাতীয় গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেলে ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করে নেওয়ার ব্যাপারে তাগিদ করা হয়েছে। (দ্র. সুহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

অহেতুক কথাবার্তা ও উঁচু আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকা। মসজিদে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬৮)

সেজন্য অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া মসজিদে অন্য কোনো কথা বলা উচিত নয়।

মসজিদে অবস্থানকালে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও অপেক্ষাকৃত সুন্দর পোশাক পরে থাকাই কাম্য। সেইসাথে নিজে পরিপাটি হয়ে থাকা এবং সামানাপত্র পরিপাটি করে রাখা। [দ্র. সূরা আ'রাফ (৭) : ৩১]

সর্বোচ্চ আবেগ ও আগ্রহের সাথে মসজিদ পরিষ্কার রাখা উচিত। একটি হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

আমার সামনে আমার উম্মতের ভালো ও মন্দ আমলসমূহ পেশ করা হয়েছে। তখন তাদের ভালো আমলগুলোর মধ্যে পেলাম- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর মন্দ আমলগুলোর মধ্যে

পেলাম- মসজিদের কফ-থুথু (ময়লা-আবর্জনা) পরিষ্কার না করা। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৫৩

ইতিকাফে বিশেষ করণীয়

ইতিকাফের সময় বান্দা যেহেতু মসজিদে থাকে, তাই মসজিদের যাবতীয় আদব রক্ষা করে থাকা উচিত। পুরো সময় সতর্কতার সাথে থাকা উচিত, যেন কোনো ধরনের কোনো গোনাহ না হয়। এছাড়াও নিম্নোক্ত আমলগুলোর ব্যাপারে খেয়াল রাখা

মসজিদের প্রধান আমল হল, জামাতের সাথে ফরয নামায আদায় করা। তাই সর্বোচ্চ গুরুতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে আদায় করা।

ইতিকাফের সময় মানুষ যেহেতু দুনিয়াবি সকল কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকে। তাই খুশু-খুযূর সাথে নামায আদায়ের বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। এসময় থেকেই খুশু-খুযূকে অভ্যাসে পরিণত করা।

রমযান মাসে প্রতিটি আমলের আজর ও সওয়াব অন্য সকল সময়ের চেয়ে বেশি। সেজন্য অধিক পরিমাণে নফল ইবাদতের চেষ্টা করা।

বিশেষ করে সুন্নত ইতিকাফ যেহেতু রমযান মাসে হয়ে থাকে, সেজন্য রমযান ও রোযার যাবতীয় হক আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

পুরো সময় কোনো না কোনো ইবাদতে মগ্ন থাকা। তবে অন্যের ইবাদত বা ঘুম-বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে, এমন উদ্যোগ পরিহার করা।

যেমন কেউ নামায পড়ছে কিংবা পাশেই বিশ্রাম করছে, সেসময় উচ্চৈঃস্বরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা।

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে কোনো কথা না বলা।

একান্ত প্রয়োজনে কথাবার্তা হলে নম্রতা, কোমলতা ও সম্মান বজায় রেখে কথা বলা।

কারো সাথে কোনো কটু কথা না বলা। ঝগড়া-তর্ক তো সব সময়ই মন্দ কাজ। মসজিদে, রমযান মাসে এবং ইতিকাফরত অবস্থায় সেটা আরো মন্দ কাজ। অতএব সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

অধিক পরিমাণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা। সালাফে সালিহীনের রমযান-কেন্দ্রিক কুরআন তিলাওয়াতের ঘটনাগুলো স্মরণ করা। সে অনুযায়ী বেশি থেকে বেশি কুরআন খতমের চেষ্টা করা। (যাদের পক্ষে সম্ভব) অর্থ মর্ম খেয়াল করে করেই তিলাওয়াত করা। অন্তত কিছু সময় তিলাওয়াতকৃত আয়াতের তরজমা, তাফসীর খেয়াল করে করে পড়া।

নফল নামাযের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া। কিছু নফল নামায তো বিভিন্ন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, যাওয়াল, আওয়াবীন ইত্যাদি। সাধারণ সময়ে নানা কর্মব্যস্ততার দরুন নিয়মিত এ নামাযগুলো আদায় করা হয় না। ইতিকাফের দিনগুলোতে যেন এর কোনোটি না ছোটে সে ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

এছাড়াও সালাতুল হাজত, সালাতুশ শোকর, সালাতুত তওবা এবং অন্যান্য নফল নামায আদায়ের চেষ্টা করা।

দীর্ঘ কিয়াম, দীর্ঘ রুকু ও দীর্ঘ সিজদাবিশিষ্ট নামাযেরও বিভিন্ন ফযীলত রয়েছে। সেজন্য ইতিকাফের সময় এভাবে দীর্ঘ নামাযের প্রতিও মনোযোগী হওয়া।

জাগতিক ব্যতিব্যস্ততার কারণে হাদীসে বর্ণিত অনেক যিকির ও তাসবীহ নিয়মিত আদায় করার সুযোগ হয় না। এছাড়াও বুযুর্গদের আমলে যিকিরের যেসব কালিমা ও পরিমাণের কথা পাওয়া যায়, সেগুলোও সুযোগমতো আদায় করার চেষ্টা করা। যেমন, ছয় তাসবীহ, বারো তাসবীহ ইত্যাদি আদায়ের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে অবস্থানই একটি স্বতন্ত্র নেক আমল। অতএব তিলাওয়াত, যিকির ও অন্যান্য আমলে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা কিংবা কিছুক্ষণ শুধু নীরবতাও অবলম্বন করা যায়। অনর্থক গল্প-কথাবার্তার চেয়ে সেটিই বেশি উত্তম।

এ সময় নির্বাচিত কিছু দ্বীনী কিতাবও অধ্যয়ন করা যায়। ইতিকাফের ফাযায়েল ও মাসায়েল এবং বুযুর্গদের ইতিকাফ ও রমযানের আমল বিষয়ক কিতাবও মুতালাআ করা যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই মহিমান্বিত আমলে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমাদের ইতিকাফকে কবুল করুন এবং তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওসীলা করুন। ইতিকাফের মাধ্যমে আমাদের ঈমান, আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুনÑ আমীন।

শবে কদর: গুরুত্ব ও ফজিলত

শবে কদর (ليلة القدر) ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত। এটি কুরআনে ও হাদিসে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। শবে কদর হল সেই বরকতময় রাত, যেদিন কুরআন নাজিল হয়েছে এবং এটি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

কুরআনে শবে কদরের উল্লেখ:

আল্লাহ তাআলা কুরআনে শবে কদর সম্পর্কে বলেন:

1. সূরা আল-কদর:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

(সূরা আল-কদর, আয়াত: ১-৫)

অর্থ:

নিশ্চয়ই আমি এটি (কুরআন) নাজিল করেছি কদরের রাতে। এবং তুমি কীভাবে জানবে কী সেই কদরের রাত? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। ওই রাতে ফেরেশতারা এবং রুহ (জিব্রাইল) তাদের প্রভুর নির্দেশে প্রত্যেকটি বিষয়ে অবতরণ করে। শান্তি বর্ষিত হয় ফজরের উদয় পর্যন্ত।

2. সূরা আদ-দুখান:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ...

(সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৩)

অর্থ:

আমি কুরআন নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে।

শবে কদর সম্পর্কে হাদিস:

1. *আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত:*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(সহিহ বুখারি, হাদিস: 2014; সহিহ মুসলিম, হাদিস: 760)

অর্থ:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় শবে কদরে কিয়াম (ইবাদত) করবে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"

2. *আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত:*

قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ :قُولِي :اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

(তিরমিজি, হাদিস: 3513)

অর্থ:

আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি জানতে পারি কোন রাত শবে কদর, তাহলে কী দোয়া করব? তিনি বললেন: তুমি বলবে: ‘‘আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন কারিম, তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্নি’’ (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, মহানুভব; তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো, তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও)।

3. *লাইলাতুল কদরের সন্ধান:*

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

(সহিহ বুখারি, হাদিস: 2017)

অর্থ:

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা শবে কদর অনুসন্ধান কর রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে।"

শবে কদরের ফজিলত:

1. এটি হাজার মাসের (৮৩ বছর ৪ মাস) ইবাদতের চেয়েও উত্তম।
2. ওই রাতে ফেরেশতারা দুনিয়ায় নেমে আসেন এবং শান্তি বর্ষিত হয়।
3. শবে কদরে ইবাদতকারীদের জন্য অগণিত সওয়াব ও মাগফিরাত রয়েছে।
4. এটি এমন এক রাত, যখন আল্লাহ তাআলা বান্দার দোয়া কবুল করেন এবং তাদের জন্য বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন।

শবে কদরের আমল:

1. তাহাজ্জুদ পড়া।
2. কুরআন তিলাওয়াত।
3. আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা।
4. উপরে বর্ণিত দোয়াটি বেশি বেশি পড়া।
5. বেশি বেশি জিকির ও দুরুদ শরিফ পাঠ করা।

শবে কদর একটি অতুলনীয় রাত। এই রাতে ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। এই রাতের ফজিলত লাভে বান্দার আন্তরিকতা, ইবাদত এবং তওবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই বরকতময় রাতের পূর্ণ ফজিলত অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

রমাদানে প্রচলিত ভুল

১. খাবারের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়া, যার ফলে মানুষ সাওম থেকে খাবার নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। এর ফলে ইফতারের পেছনে হাজার হাজার টাকা অপচয় করা হয় যদিও একজন মানুষের এত পরিমাণ খাবারের দরকার হয় না।

২. ফজরের সালাতের অনেক আগে সাহরি করা- কেউ কেউ তারাওয়িত্ব অথবা ইশার সালাতের কয়েক ঘণ্টা পরেই সাহরি খেয়ে ফেলেন, এটি ঠিক নয়। ফজরের সালাতের কাছাকাছি সময়ে সাহরি করা উচিত।

৩. রামাদানে সাওম রাখার জন্য মানুষ নিয়াত করে না, এটা ভুল। আর নিয়াত মনে মনে করলেই চলে; মুখে বলার দরকার নেই। নিয়াত রামাদানের শুরুতে একবার করলেই হয়, প্রতিদিন করার দরকার নেই।

৪. যদি আপনি দেরিতে বুঝতে পারেন যে, সাহরি শেষ আর রামাদান শুরু হয়ে গেছে, তাহলে আপনার উচিত তখনই খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে ওইদিন সাওম রাখা এবং পরবর্তীতে রামাদান বা ঈদের শেষে ওই সাওমের কাযা আদায় করে নেয়া।

৫. এমন অনেক লোক আছেন যারা মনে করেন, রামাদানের প্রথম রাতে তারাওয়িহ্ পড়তে হয় না। তারা মনে করেন, যেদিন সাওম রাখা হয়, সেদিনের রাত থেকে তারাওয়িহ্ পড়তে হয়। কিন্তু তারা ভুলে যান, আরবি মাসের হিসাব চাঁদের সাথে, মাগরিবের পর থেকেই নতুন দিন শুরু হয়।

৬. অনেক লোক মনে করেন, ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেললে কিংবা পান করে ফেললে সাওম ভেঙে যায়; এটা ভুল ধারণা। যদি ভুলবশত এমনটি হয়ে যায়, তবে সাওম চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং এর কাযা আদায় করতে হবে না।

৭. কিছু মানুষ এরকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন- কাউকে কিছু খেতে বা পান করতে দেখলে তাকে মনে করিয়ে দেয়া উচিত নয় যে, সে সাওম অবস্থায় আছে। শাইখ বিন বাযের মতে এটা ভুল, কারণ আল্লাহতায়ালা আমাদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই আমরা তাকে বিরত থাকতে বলবো, কারণ এভাবেই আমরা অসৎ কাজে নিষেধ করছি।

৮. অনেক বোন মনে করেন, সাওম রাখা অবস্থায় তাঁরা মেহেদি ব্যবহার করতে পারবেন না; এটাও ভুল। রামাদানেও তাঁরা মেহেদি ব্যবহার করতে পারবেন।

৯. কিছু লোকের বিশ্বাস, সাওম অবস্থায় রান্নাবান্নার সময় মসলা বা ঘ্রাণ ঠিক আছে কিনা বোঝার জন্য স্বাদ চেখে দেখা যাবে না; এটা ভুল। ইসলামে এরকম স্বাদ চেখে দেখা বৈধ, যদি না রাঁধুনি খাবার খেয়ে ফেলেন। খাবারে আরও লবণ বা মসলা লাগবে কিনা, তা বোঝার জন্য স্বাদ চেখে দেখা যাবে।

১০. অনেকে মনে করেন, সাওম থাকাকালীন অবস্থায় মিসওয়াক বা টুথব্রাশ ব্যবহার করা যাবে না। এ ধারণাটি ভুল; কারণ রাসুল রামাদানের সময় মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। আপনি টুথপেস্টও ব্যবহার করতে পারেন। এর যুক্তি হিসেবে আলিমগণ বলেন, মিসওয়াকে ফ্লেভার থাকে, তাই টুথপেস্ট ব্যবহারেও বাধা নেই (যদি না আপনি তা খেয়ে ফেলেন)।

১১. কেউ কেউ ফজরের আযান তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলেন যাতে লোকেরা ফজরের আগে খাওয়া- দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তাদের সাওম যাতে অশুদ্ধ না হয়। এটি ভুল এবং এরকম করা অনুচিত।

১২. কিছু লোক মাগরিবের আযান দেরি করে দেন, যাতে লোকেরা দেরিতে ইফতার শুরু করে। যদি মাগরিবের সময় তখনও না হয়ে থাকে- এই ভেবে তারা এমনটি করে থাকেন। এটাও ভুল এবং এরকম করাও আমাদের জন্য অনুচিত।

১৩. অনেক লোক মনে করেন, পুরো রামাদান মাসে কেউ তাঁর সহধর্মিণীর সাথে সহবাস করতে পারবেন না। এরকম ধারণা ভুল। আপনি কেবল সাওম থাকাকালীন অবস্থায় এমনটি করতে পারবেন না কিন্তু মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত আপনার জন্য তা বৈধ।

১৪. অনেক মহিলা বিশ্বাস করেন যে, যদি তাঁদের ঋতুস্রাব সবেমাত্র শেষ হয় আর তাঁরা যদি গোসল না করেন, তাহলে সাওম রাখতে পারবেন না (এমন ভেবে যে, তাঁদের ঋতুস্রাব রাতে শেষ হলো আর তাঁরা গোসল না করেই ঘুমোতে গেলেন এবং এমন সময় উঠলেন যখন আর গোসল করতে পারলেন না)। এটা ভুল ধারণা; যদি কোনো মহিলা গোসল না করে থাকেন, তবুও তিনি সাওম রাখতে পারবেন।

১৫. অনেক পুরুষ মনে করেন, স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর যদি তাঁরা গোসল করতে না পারেন (ওপরের অবস্থার মতো), তাহলে সকালে সাওম রাখতে পারবেন না; এটাও ভুল। গোসল না করে থাকলেও তিনি সাওম রাখতে পারবেন।

১৬. কেউ কেউ রামাদানের সময় যুহর ও আসরের সালাত একসাথে পড়েন (বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে)। এটা ঠিক নয়; এমনটি পরিহার করা উচিত।

১৭. কিছু মানুষ মনে করেন, মুয়াজ্জিন মাগরিবের আযান শেষ না করা পর্যন্ত ইফতার শুরু করা যাবে না; এটা সঠিক নয়। মুয়াজ্জিনের আযান শুরুর মুহূর্ত থেকেই ইফতার করা যাবে।

১৮. অনেকে ইফতারের আগে দুয়া করেন না। অথচ এটি হলো সেই তিনটি বিশেষ সময়ের একটি সময়, যে সময়গুলোতে আল্লাহ্ বান্দার দুয়া কবুল করেন।

১৯. অনেকে রামাদানের শেষসময় রামাদানকে অবহেলা করে ঈদের প্রস্তুতির কাজে অহেতুক সময়ের অপচয় করেন; এ ঠিক নয়। আসলে ওই লোকেরা রমাদানের প্রকৃত ধারণাই খুইয়ে বসেছে।

২০. অনেক পিতামাতা তাঁদের বাচ্চাদের সাওম রাখা থেকে বিরত রাখেন; এটি বাচ্চাদের জন্য ভালো নয়। ছোটবেলা থেকেই সাওম রাখার অভ্যাস গড়ে তুললে সে বুঝতে শিখবে যে, এ বিষয়টি পালন তাকে করতেই হবে।

২১. অনেক লোক মনে করেন, রামাদানের মানে কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকা। তারা নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে ভুলে যান এবং নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখার ধার ধারেন না; অথচ রামাদানে আমাদের মেজাজ আর জিহ্বাকে আরও বেশি সংযত রাখার কথা ছিলো।
২২. লোকেরা প্রায়ই রামাদানের মূল্যবান সময়কে অহেতুক অপচয় করেন। সাওম রেখে তারা ঘুমিয়ে থাকেন, কোনো আমল করেন না। বেশি বেশি নফল ইবাদত করার মাধ্যমে আমাদের উচিত এই মহিমান্বিত মাসের পুরিপূর্ণ ব্যবহার করা।
২৩. কিছু লোক রামাদানের সময় সফর করেন না। তাঁরা মনে করেন, ভ্রমণ করলে তাঁদেরকে সাওম ভাঙতে হবে। এটি আসলে ইচ্ছাধীন বিষয়। আপনি যদি ভ্রমণের সময় সাওম রাখতে না চান, তাহলে তা ভাঙতে পারবেন (পরে এর কাযা আদায় করতে হবে) আর আপনি যদি সাওম ভাঙতে না চান, তাহলে সেটিও করতে পারবেন।
২৪. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক মসজিদে ইতিকাফ করেন না। আমাদের নিজেদের সুস্বাস্থ্যের ফায়দা উঠানো দরকার এবং মসজিদে বেশি সময় পার করা উচিত, বিশেষ করে রামাদানের শেষের দশদিনে।
২৫. কিছু লোক মনে করেন, রামাদান মাসে চুল বা নখ কাটা যাবে না; এটাও ভুল ধারণা।
২৬. কিছু লোককে বলতে শোনা যায়, রামাদানের সময় নিজের থুথু গেলা যাবে না; এটা ভুল ধারণা। তবে মুখে আসা শ্লেষ্মা গেলা উচিত নয়।
২৭. কিছু লোককে বলতে দেখা যায়, রামাদানের সময় সুগন্ধি তেল বা আতর ব্যবহার করা যাবে না; এটাও ভুল ধারণা।
২৮. কিছু লোক মনে করেন, রক্তপাত সাওমকে ভেঙে ফেলে; এটি ঠিক নয়।
২৯. কিছু মানুষ মনে করেন যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করলেও সাওম ভেঙে যায়; এটা ঠিক নয়। তবে আপনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেন তাহলে সাওম ভেঙে যাবে।
৩০. কিছু লোক মনে করেন, রামাদানে ওযুর সময় মুখ কিংবা নাকে পানি নেয়া যাবে না; এটাও ঠিক নয়।

রোজা সংক্রান্ত সাধারণ ভুল ও সংশোধনঃ

রোজা হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা শুদ্ধতার সঙ্গে পালন করা আবশ্যক। তবে অনেক সময় অজ্ঞতা বা অসতর্কতার কারণে মানুষ এমন কিছু কাজ করে, যা রোজার শুদ্ধতাকে প্রভাবিত করে। রোজা ভঙ্গের কারণ, শুদ্ধতা নিশ্চিত করার উপায়, এবং রোজা রাখার সময় যে বিষয়গুলোতে সচেতন থাকতে হবে তা নিয়ে ইসলামে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এখানে এসব বিষয় হাদিসসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

রোজা ভঙ্গের কারণ ও উপায়ঃ

রোজা ভঙ্গের কিছু স্পষ্ট কারণ রয়েছে, যা রোজাদারের জানা থাকা আবশ্যক। ভুলবশত বা জেনে-শুনে এসব কাজ করলে রোজা ভঙ্গ হয়, এবং সে ক্ষেত্রে কাফফারা বা কাজা পালন করতে হয়।

রোজা ভঙ্গের কারণগুলো:

1. **খাওয়া বা পান করা:**

   ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খেলে বা পান করলে রোজা ভেঙে যায়।

   হাদিস:

   রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

   "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা থাকা অবস্থায় কিছু খায় বা পান করে, তার রোজা ভেঙে যাবে এবং তাকে তা কাফফারা দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।"

   — (সহিহ বুখারি)

2. **যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা:**

   রোজার সময় স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে রোজা ভেঙে যায় এবং কাফফারা আদায় করতে হয়।

   হাদিস:

   এক সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন, তিনি রোজার মধ্যে স্ত্রী সহবাস করেছেন। তখন রাসুলুল্লাহ তাকে একাধারে ৬০ জন গরিবকে খাবার দান করার নির্দেশ দেন।

   — (সহিহ মুসলিম)

3. **ইচ্ছাকৃত বমি:**

   রোজার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে রোজা ভেঙে যায়।

   হাদিস:

   রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

   "যদি কারও রোজা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হয়, তবে তার রোজা নষ্ট হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে করলে রোজা ভেঙে যাবে।"

   — (আবু দাউদ)

4. **ঋতুস্রাব বা সন্তান প্রসবজনিত রক্তপাত শুরু হওয়া:**
   নারীদের ক্ষেত্রে রোজার মধ্যে ঋতুস্রাব শুরু হলে বা সন্তান প্রসবজনিত রক্তপাত হলে রোজা ভেঙে যায়।
   কুরআনে বলা হয়েছে:
   "তোমরা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সালাত ও সিয়াম পালন করো না।"
   — (সূরা আল-বাকারা: ২২২)

ভঙ্গ হলে কী করতে হবে?

- **কাজা রোজা:** যে ব্যক্তি অসাবধানতাবশত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভঙ্গ করেছে, তাকে পরে ওই রোজার কাজা পালন করতে হবে।
- **কাফফারা:** ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভঙ্গ করলে তাকে ধারাবাহিকভাবে ৬০ দিন রোজা রাখতে হবে অথবা ৬০ জন গরিবকে খাদ্য দান করতে হবে।

রোজার শুদ্ধতা নিশ্চিত করার উপায়

রোজা রাখার শুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। রোজা শুধু শারীরিক ইবাদত নয়; এটি আত্মিক এবং নৈতিক ইবাদতও বটে। তাই রোজাদারকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

শুদ্ধতা নিশ্চিত করার কয়েকটি উপায়:

1. **নিয়ত:**
   রোজার শুরুতেই সঠিকভাবে নিয়ত করতে হবে। রোজার জন্য নিয়ত করা আবশ্যক।
   হাদিস:
   রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
   "সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।"
   — (সহিহ বুখারি)

2. **জিহ্বা এবং চোখের হেফাজত:**
   রোজার শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য জিহ্বাকে গীবত, মিথ্যা কথা, এবং কটূক্তি থেকে সংযত রাখতে হবে। চোখকেও হারাম থেকে হেফাজত করতে হবে।
   কুরআনে বলা হয়েছে:
   "তোমরা অন্যের সম্পর্কে কটূক্তি করো না এবং হারামে জড়িও না।"

— (সূরা আল-হুজুরাত: ১২)

3. **ইবাদতে মনোনিবেশ:**
রোজার সময় বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা, নামাজ আদায় করা, এবং দোয়া করার মাধ্যমে সময় কাটাতে হবে।

4. **সন্দেহজনক কাজ এড়িয়ে চলা:**
এমন কোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা রোজার শুদ্ধতা নষ্ট করতে পারে, যেমন অহেতুক কথা বলা বা ঝগড়া করা।
হাদিস:
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
"রোজা শুধু খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থাকার নাম নয়, বরং অশ্লীল কথা এবং খারাপ কাজ থেকেও বিরত থাকা।"
— (ইবনে মাজাহ)

রোজা রাখার সময় সচেতনতা

রোজা রাখার সময় কিছু বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হতে হয়, যাতে রোজার মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং এটি গ্রহণযোগ্য হয়।

রোজার সময় যে বিষয়গুলোতে সচেতন থাকতে হবে:

1. **সাহরি এবং ইফতারে সময়নিষ্ঠা:**
   সাহরি এবং ইফতার যথাসময়ে করা সুন্নাহ। সাহরি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করা উচিত এবং ইফতার দ্রুত করা উচিত।
   হাদিস:
   রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
   "মানুষ যতদিন সাহরি এবং ইফতার যথাসময়ে করবে, ততদিন তারা কল্যাণে থাকবে।"
   — (সহিহ বুখারি)

2. **অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা:**
   যেমন অতিরিক্ত ঘুমানো, অলসতা করা বা অন্যদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হওয়া।
   হাদিস:
   "যদি কেউ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়, তবে বলো, আমি রোজাদার।"
   — (সহিহ বুখারি)

3. **সুন্নাহ অনুযায়ী দোয়া:**
   ইফতারের সময় এবং রোজার প্রতিটি মুহূর্তে দোয়া করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
   দোয়া:
   "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসালুকা রিদাক ওয়া জান্নাতাকা।"
   — (ইবনে মাজাহ)

4. **সাহরি ত্যাগ না করা:**
   অনেকেই সাহরি না খেয়ে রোজা রাখার চেষ্টা করেন, যা সুন্নাহ পরিপন্থী।
   হাদিস:
   রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
   "সাহরিতে বরকত রয়েছে। সাহরি খাও।"
5. — (সহিহ মুসলিম)

রোজার সামাজিক এবং বৈশ্বিক প্রভাব

রোজা শুধু ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি বা তাকওয়ার ইবাদত নয়; এটি সামাজিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও গভীর প্রভাব ফেলে। রোজার মাধ্যমে সমাজে সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, এবং একতা সৃষ্টি হয়। বৈশ্বিকভাবে রোজার ধারণা বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিতেও বিদ্যমান, যা মানবজীবনে এর প্রভাবের ব্যাপকতাকে প্রকাশ করে। এখানে ইসলামিক সমাজে রোজার গুরুত্ব, বৈশ্বিক প্রভাব, এবং অন্যান্য ধর্মে রোজার ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো, হাদিসসহ।

ইসলামিক সমাজে রোজার গুরুত্বঃ

ইসলামিক সমাজে রোজার গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। এটি ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১. সমাজে সহানুভূতির সৃষ্টি:

রোজা মানুষকে অভাবী এবং দুস্থ মানুষের কষ্ট অনুভব করার সুযোগ দেয়। রোজাদার নিজে যখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার্ত থাকে, তখন সে অন্যদের অবস্থা বুঝতে পারে এবং সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।

হাদিস:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"যে ব্যক্তি একটি রোজাদারকে ইফতার করায়, সে তার সমান সওয়াব পাবে, রোজাদারের সওয়াব কমানো হবে না।"

— (তিরমিজি)

২. ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবোধের শক্তিশালীকরণ:

রোজা মুসলিম সমাজে ঐক্যের বার্তা দেয়। পুরো সমাজ একসঙ্গে ইফতার করা, তারাবিহ নামাজ আদায় করা এবং রমজান মাসে সৃষ্ট নৈতিক পরিবেশ এটি নিশ্চিত করে।

৩. অপরাধ কমানো:

রমজানের সময় ইসলামিক সমাজে নৈতিকতার চর্চা বৃদ্ধি পায়। মানুষ মিথ্যা, চুরি, এবং অন্যান্য অপরাধ থেকে বিরত থাকে। এটি সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

কুরআনে বলা হয়েছে:

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রোজার মূল্য

রোজার প্রভাব শুধু ইসলামিক সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

১. মানবিকতা ও সহানুভূতির প্রসার:

রোজার মাধ্যমে ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট অনুভব করার যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা মানবিকতাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা এবং মুসলিম সম্প্রদায় রমজান মাসে সারা পৃথিবীতে খাদ্য বিতরণ ও দানের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২. নৈতিক শিক্ষা:

রোজা মানুষকে নিজেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার শিক্ষা দেয়। এভাবে এটি কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব এবং দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৩. শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা:

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত মুসলিমরা একই নিয়মে রোজা পালন করে। এটি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দেয়।

৪. স্বাস্থ্য সচেতনতা:

রোজার ফলে সারা বিশ্বে মানুষ খাদ্যাভ্যাস নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। এটি শরীরের জন্য উপকারী এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানেও সহায়ক।

হাদিস:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"তোমরা রোজা রাখো, যাতে তোমরা সুস্থ থাকতে পারো।"

— (ইবনে মাজাহ)

রোজার কথা মনে থাকুক বছর জুড়ে

রোজার শিক্ষা: সারা বছরের জন্য একটি প্রেরণা

রমাদান মাসে রোজা রাখার অভ্যাস শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, বরং এটি একটি চিরস্থায়ী শিক্ষা। রোজা আমাদের আত্মশুদ্ধি, সংযম, ধৈর্য, এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য শেখায়। এই শিক্ষাগুলো রমাদানের পরে সারা বছর ধরে রাখা উচিত, যাতে আমাদের জীবন আরও সুন্দর ও অর্থবহ হয়।

রোজার মূল শিক্ষা

১. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযম:

রোজা আমাদের শিখায় কীভাবে নিজের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাগুলোকে সংযত রাখতে হয়। রোজা রাখার মাধ্যমে আমরা আমাদের ক্ষুধা ও পিপাসার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করি, যা আমাদের জীবনের অন্যান্য দিকেও প্রভাব ফেলে।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :الصِّيَامُ جُنَّةٌ.

(সহীহ বুখারি: ১৮৯৪, সহীহ মুসলিম: ১১৫১)

অর্থ: "রোজা ঢালের মতো, যা তোমাকে পাপ থেকে রক্ষা করে।"

২. ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল:

রোজা আমাদের ধৈর্যের চূড়ান্ত শিক্ষা দেয়। সারাদিন না খেয়ে থাকা এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল থাকার চর্চা আমাদের জীবনের সব কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে মোকাবিলা করতে শেখায়।

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ.

(সূরা আয-জুমার: ১০)

অর্থ: "নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের প্রতিদান তাদের হিসাব ছাড়াই দেওয়া হবে।"

৩. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য:

রোজার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার অভ্যাস করি। এই আনুগত্যের চর্চা আমাদের সারা বছর আল্লাহর পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করে।

রোজার শিক্ষা সারা বছর ধরে রাখার উপায়

১. নফল রোজা পালন:

রমাদানের পর সারা বছর নিয়মিত নফল রোজা রাখা উচিত। যেমন:

- শাওয়ালের ছয়টি রোজা।
- প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা।
- আরবি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ ٱلدَّهْرِ.

(সহীহ মুসলিম: ১১৬৪)

অর্থ: “যে ব্যক্তি রমাদানের রোজার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখে, সে যেন পুরো বছরের রোজা রাখল।”

২. **কুরআন তিলাওয়াত:**

রমাদানে কুরআনের সঙ্গে যে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়, তা সারা বছর ধরে রাখা উচিত। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও তার অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

৩. **সদকা ও দান:**

রোজার মাসে আমরা দানশীলতার অনুশীলন করি। এই অভ্যাস সারা বছর ধরে রাখলে আমাদের চরিত্র আরও উন্নত হবে।

৪. **আখলাক উন্নয়ন:**

রোজার মাধ্যমে আমরা শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা পাই। পবিত্র রমাদানের পরও এই গুণগুলো জীবনে ধারণ করা উচিত।

রমাদান পরবর্তী রোজার প্রভাব

রোজা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি আমাদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে। রমাদানের শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো যায়।

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :أَحَبُّ ٱلْأَعْمَالِ إِلَى ٱللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.

(সহীহ বুখারি: ৬৪৬৫)

অর্থ: “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো সেই কাজ, যা ধারাবাহিকভাবে করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।”

রোজার শিক্ষা শুধু রমাদান মাসে সীমাবদ্ধ নয়। এটি আমাদের পুরো জীবনের জন্য একটি অনুপ্রেরণা। আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য, এবং আল্লাহর আনুগত্যের এই শিক্ষা আমাদের চরিত্র গঠন ও জীবন পরিচালনায় সহায়তা করে।

কেমন হবে রমাদান পরবর্তী জীবন

রমাদান পরবর্তী জীবন: এক নতুন সূচনা

রমাদান মাস হলো আত্মশুদ্ধি ও সংযমের প্রশিক্ষণের একটি বিশেষ সময়। এই মাসের ইবাদত, রোজা, দোয়া এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চা আমাদের জীবনে স্থায়ী ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। রমাদানের পরে জীবনে এই চর্চাগুলো ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমরা আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর রহমত অর্জন করতে পারি।

রমাদানের শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন

১. ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা:

রমাদানে আমরা তারাবিহ, তাহাজ্জুদ এবং নিয়মিত নামাজের মাধ্যমে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ বাড়াই। রমাদান শেষে এই অভ্যাস ধরে রাখা উচিত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ.

(সহীহ বুখারি: ১১৪৬)

অর্থ: "আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের ইবাদতে এত বেশি সময় দিতেন যে তাঁর পায়ের তলা ফেটে যেত।"

২. সিয়ামের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা:

রমাদান শেষে শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ।

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ ٱلدَّهْرِ.

(সহীহ মুসলিম: ১১৬৪)

অর্থ: "যে ব্যক্তি রমাদানের রোজার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখে, সে যেন পুরো বছরের রোজা রাখল।"

৩. আখলাক উন্নয়ন:

রমাদানে শিষ্টাচার, ধৈর্য এবং সংযম চর্চা করা হয়। রমাদান পরবর্তী জীবনে এগুলোকে জীবনের অংশ বানানো উচিত।

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ ٱلْأَخْلَاقِ.

(মুসনাদে আহমদ: ৮৯৫২)

অর্থ: "আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য।"

রমাদান পরবর্তী জীবনের উদ্দেশ্য

১. তাওবার ধারাবাহিকতা:

রমাদান মাসে আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। এই অভ্যাস রমাদানের পরেও অব্যাহত রাখা উচিত।

২. সদকা ও দানশীলতা বৃদ্ধি:

গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করার অভ্যাস শুধু রমাদানে নয়, সারাবছর চালু রাখা উচিত।

৩. কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা:

রমাদানে কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস শুরু করলে তা সারাবছর চালিয়ে যেতে হবে।

রমাদান পরবর্তী জীবন এমন হওয়া উচিত, যেখানে রমাদানের প্রতিটি শিক্ষা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। এটি একটি নতুন সূচনা, যেখানে আমরা রমাদানের প্রভাব ধরে রেখে সৎকর্মে অগ্রসর হব। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং মানুষের প্রতি দয়ালু আচরণ আমাদের জীবনকে আরও সুন্দর এবং সফল করে তুলবে।

উপসংহার

রোজার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

রোজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন। রোজা মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে এবং ভালো কাজের প্রতি মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করে। এটি আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের এক চমৎকার পন্থা।

আত্মিক প্রভাব:

1. **তাকওয়া বৃদ্ধি:**
   রোজা মানুষকে আল্লাহর প্রতি ভয় এবং ভালোবাসা অনুভব করতে শেখায়।
   কুরআনে বলা হয়েছে:
   "হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"
   — (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

2. **ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব:**
   রোজার সময় মানুষ বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ এবং দান-সদকা করে, যা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ঘটায়।
   হাদিস:
   রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
   "রমজান মাস এমন একটি মাস, যার শুরু রহমত, মধ্যভাগ মাগফিরাত এবং শেষ অংশ নাজাত।"
   — (মিশকাত)

3. **অধিকারবোধ জাগ্রত করা:**
   রোজার মাধ্যমে মানুষ শিখে যে, তাদের জীবনে আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

রোজার শারীরিক এবং সামাজিক ফজিলত

রোজা শুধু আত্মিক ইবাদত নয়; এটি শারীরিক ও সামাজিক দিক থেকেও মানুষকে উপকৃত করে।

শারীরিক ফজিলত:

1. **স্বাস্থ্য সচেতনতা:**
   রোজার মাধ্যমে দেহের বিষাক্ত পদার্থ দূর হয় এবং পাচনতন্ত্রের বিশ্রাম হয়।
   হাদিস:
   রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
   "তোমরা রোজা রাখো, যাতে তোমরা সুস্থ থাকতে পারো।"
   — (ইবনে মাজাহ)

2. **উচ্চ রক্তচাপ এবং স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ:**
   রোজা দেহে মেটাবলিজমের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সামাজিক ফজিলত:

1. **সহানুভূতির প্রসার:**
   রোজাদার নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দরিদ্রদের কষ্ট বুঝতে শেখে এবং তাদের সাহায্যের জন্য আগ্রহী হয়।
   হাদিস:
   রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
   "তোমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারবে না, যতক্ষণ না একে অপরের জন্য যা ভালোবাসো, তা নিজেদের জন্যও চাও।"
   — (সহিহ বুখারি)

2. **সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব:**
   রমজান মাসে সমাজের সব মানুষ একসঙ্গে ইফতার, তারাবি এবং অন্যান্য ইবাদতে অংশ নেয়। এটি ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য বৃদ্ধি করে।

3. **অপরাধের হার কমানো:**
   রোজার সময় ইসলামিক সমাজে অপরাধের হার কমে যায়, কারণ মানুষ আল্লাহর ভয় এবং তাকওয়ার মাধ্যমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে।

ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি

রোজার ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ইতিবাচক। এটি কেবল একটি মাসিক ইবাদত নয়; বরং মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সারাজীবনের পথপ্রদর্শক।

ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি:

1. **সংযমের অভ্যাস:**
   রোজার মাধ্যমে অর্জিত সংযম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়।
2. **আত্মশুদ্ধি:**
   নিয়মিত রোজার চর্চা মানুষকে জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে পরিশুদ্ধ হতে সাহায্য করে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি:

1. **একটি নৈতিক সমাজ গঠন:**
   রোজার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সমাজে নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
2. **দরিদ্রদের উন্নয়ন:**
   রোজার সময় দান-সদকা বৃদ্ধির ফলে দরিদ্রদের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি:

1. **সম্প্রীতি এবং শান্তি:**
   রোজার মাধ্যমে সারা বিশ্বের মুসলিমরা এক অভিন্ন উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, যা বিশ্ব শান্তিতে ভূমিকা রাখে।
2. **পরিবেশ সুরক্ষা:**
   রোজা কম ভোগবাদের একটি চর্চা, যা পৃথিবীর সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সহায়তা করে।

তালিকা ও রেফারেন্স

রোজার গুরুত্ব, ফজিলত, এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণায় সুনির্দিষ্ট তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য নির্ভরযোগ্য উৎস ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। নিচে কুরআন, হাদিস, ইসলামিক গ্রন্থ, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, এবং গবেষণামূলক নিবন্ধের রেফারেন্স সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

কুরআন, হাদিস এবং ইসলামিক গ্রন্থের রেফারেন্স

কুরআনের রেফারেন্স

1. **সূরা আল-বাকারা (২:১৮৩-১৮৫):**
   রোজার বিধান, উদ্দেশ্য, এবং লাইলাতুল কদরের আলোচনা।
2. **সূরা আল-হুজুরাত (৪৯:১৩):**
   মানবজাতির ঐক্যের গুরুত্ব।
3. **সূরা আন-নাহল (১৬:১২৮):**
   তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ।
4. **সূরা আল-কাদর (৯৭):**
   লাইলাতুল কদরের ফজিলত।

হাদিসের রেফারেন্স

1. **সহিহ বুখারি:**
   রোজার ফজিলত ও নিয়মাবলী।
   - হাদিস: "যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে এবং সওয়াবের আশায় রোজা রাখে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করা হয়।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৮)
2. **সহিহ মুসলিম:**
   রোজার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের আলোচনা।
   - হাদিস: "রোজা তোমার জন্য ঢালস্বরূপ।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১১৫১)
3. **তিরমিজি:**
   রমজানের রহমত, মাগফিরাত, এবং নাজাতের আলোচনা।
   - হাদিস: "রমজান এমন একটি মাস, যার শুরু রহমত, মধ্যভাগ মাগফিরাত এবং শেষ অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তি।" (তিরমিজি, হাদিস: ৬৮২)
4. **ইবনে মাজাহ:**
   রোজার শারীরিক উপকারিতার আলোচনা।
   - হাদিস: "তোমরা রোজা রাখো, যাতে তোমরা সুস্থ থাকতে পারো।" (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৬৯৪)

ইসলামিক গ্রন্থের রেফারেন্স

1. **ইমাম নববীর "রিয়াদুস সালিহিন"**
   রমজানের ফজিলত এবং ইবাদতের গুরুত্ব।
2. **ইমাম গাজ্জালীর "ইহইয়া উলুমিদ্দিন"**
   আত্মশুদ্ধি এবং তাকওয়ার গুরুত্ব।
3. **"ফিকহুস সুন্নাহ" (সাইয়্যেদ সাবিক):**
   রোজার বিধি-বিধান এবং নিয়মাবলী।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স

খ্রিস্টধর্মের গ্রন্থ

1. **বাইবেল (ম্যাথিউ ৬:১৬-১৮):**
   উপবাসের নিয়ম ও গুরুত্ব।
2. **লেন্ট (Lent) পদ্ধতি:**
   আত্মশুদ্ধি এবং প্রার্থনার উপবাসকাল।

ইহুদি ধর্মের গ্রন্থ

1. **তানাখ (Tanakh):**
   ইয়োম কিপুরের উপবাসের উল্লেখ।
2. **"তোরাহ":**
   পাপমুক্তির উপবাস।

হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ

1. **গীতা (৬:১৬-১৮):**
   উপবাস ও ধ্যানের গুরুত্ব।
2. **"মনুস্মৃতি":**
   একাদশীর ব্রতের নিয়ম।

বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থ

1. **"ত্রীপিটক":**
   উপবাস এবং ধ্যানের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব।

গবেষণামূলক নিবন্ধ এবং বইয়ের তালিকা

ইসলামিক গবেষণামূলক নিবন্ধ ও বই

1. **"ফাস্টিং ইন ইসলাম: স্পিরিচুয়াল এন্ড ফিজিকাল বেনিফিটস"**
   লেখক: ড. জাকির নায়েক।

2. **"ইসলামিক এথিক্স এন্ড রিচুয়ালস অফ রমজান"**
   লেখক: ড. মুহাম্মদ কুতুব।
3. **"সায়েন্টিফিক মিরাকলস অফ ফাস্টিং"**
   গবেষক: ড. ইয়াহিয়া ইব্রাহিম।

স্বাস্থ্য ও শারীরিক উপকারিতা সম্পর্কিত গবেষণা

1. **"ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং এন্ড হিউম্যান হেলথ"**
   লেখক: মার্ক ম্যাটসন।
   প্রকাশিত: জার্নাল অফ নিউরোলজিক্যাল সায়েন্সেস।
2. **"ফাস্টিং এন্ড মেটাবলিজম রিগুলেশন"**
   গবেষক: ড. রুহুল আমিন।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক গ্রন্থ

1. **"রোজা: সোশ্যাল ইম্প্যাক্টস ইন ইসলামিক কালচার"**
   লেখক: ড. হাসান আলী।
2. **"ইসলামিক সোশ্যাল রিচুয়ালস"**
   গবেষক: ড. আমির আহমদ।

উপরোক্ত তালিকা ও রেফারেন্সগুলো রোজার আধ্যাত্মিক, শারীরিক, এবং সামাজিক গুরুত্ব বুঝতে সহায়ক। বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ, গবেষণামূলক নিবন্ধ এবং ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন ও হাদিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রোজার প্রভাব ও উপকারিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব।